বর্ষ ৩, সংখ্যা ৫, ডিসেম্বর ২০১৪ - জানুয়ারি ২০১৫ মূল্য `১০
Vol.3, Issue 5, RNI No.WBBEN/2012/42493, Dec 2014 - Jan 2015, Price `10/- only

প্রভুবার্তা

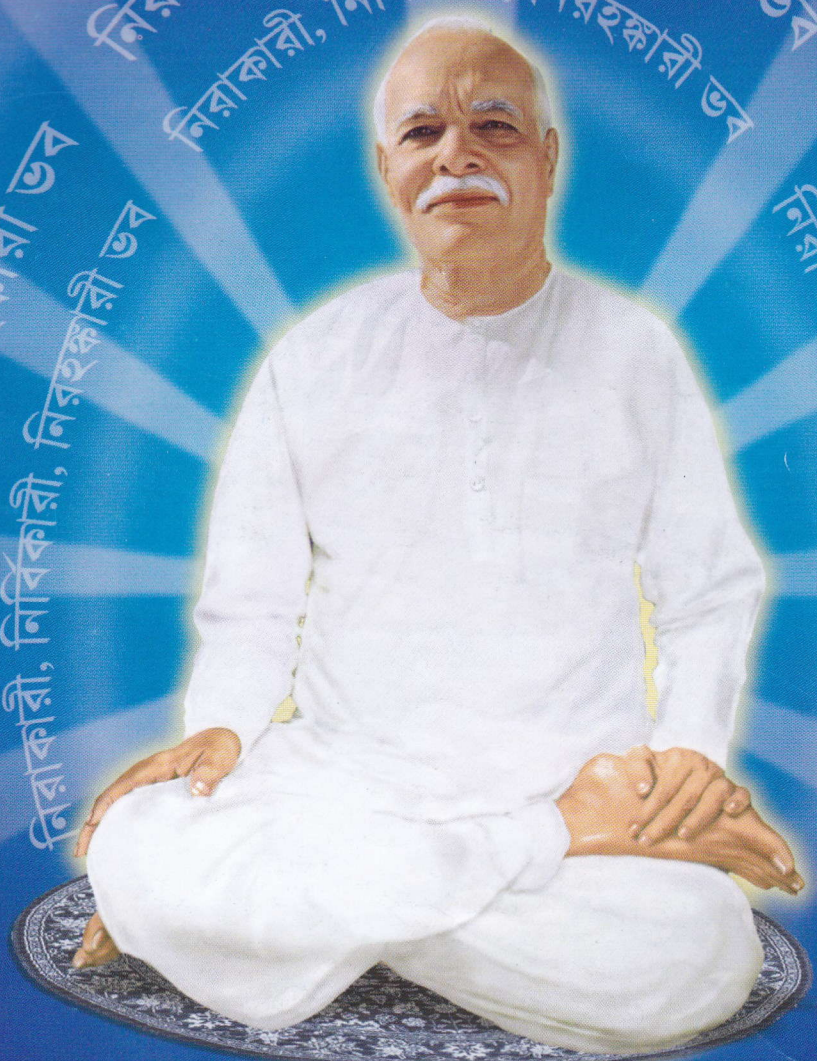

আদিদেব প্রজাপিতা ব্রহ্মাবাবা

Vol.3, Issue 5, RNI No.WBBEN/2012/42493, Dec 2014 - Jan 2015, Price `10/- only

কলকাতা (মিউজিয়াম) ঃ (বামদিকে) চৈতন্য দুর্গা উপলক্ষ্যে ব্রহ্মাকুমারী ভগিনীরা দেবীরূপে সুসজ্জিতা। (ডানদিকে) অনুষ্ঠান উদ্বোধনে দীপ প্রজ্বলন করছেন ইস্টার্ন রেলওয়ে জি.এম. ভ্রাতা রামকুমার গুপ্তা, বি.কে. মাধুরি, বি.কে. মুন্নি ও অন্যান্যরা।

আসানসোল ঃ জীবন্ত দুর্গা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত মুখ্য অতিথি পুলিশ কমিশনার ভ্রাতা বিনিত কুমার গোয়েল এবং শ্রমমন্ত্রী ভ্রাতা মলয় ঘটক।

শ্যামনগর ঃ জগদ্দল বুদ্ধবিহার দ্বারা আয়োজিত 'দানোত্তম শুভ কঠিন চীবর দানোৎসব' অনুষ্ঠানে ভাষণরতা বি.কে. কমলা।

কলকাতা ঃ কেনেলওয়ার্থ হোটেল-এ আয়োজিত 'স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ে বক্তব্য রাখছেন বি.কে. চন্দ্রা সঙ্গে বি.কে. রুমকি।

সম্পাদকীয়

বর্তমান বৎসরের শেষ ও নতুন বৎসরের শুরু - এই সময়টা খুবই মূল্যবান। ফিরে দেখা - কী করেছি - নতুন করে ভাবা, কী করতে চলেছি। নিজের হিসাব যাচাই করে দেখার এটাই সময়। যে নির্দেশ বাবা দিয়েছেন সেই অনুযায়ী আমি কতটা চলেছি। নিজেকে কতটা পরিবর্তন করেছি, নিজে খুশি হয়েছি? বাবাকে খুশি করতে পেরেছি? বাবার 'হৃদয়-সিংহাসনে'বসতে পেরেছি? কতজনকে বাবার সঠিক পরিচয় দিয়ে তাকেও 'বাপস্নেহী' করেছি? নিয়ম অনুযায়ী যখন এই লেখা লিখতে বসেছি তখন বাবার এই সিজন-এ আসার আরও কয়েকটা দিনের প্রতীক্ষা বাকি - মনের ভিতর তোলপাড়, বাবা এসে কী শোনাবেন, কী কী সমাচার, নতুন কী কী নির্দেশ দেবেন! সেকেন্ড বাই সেকেন্ড সময় বয়েই চলেছে - এই কল্পের অন্তিম সময় এগিয়েই আসছে। আমাদের সকলের তল্পিতল্পা বাঁধা হয়ে গিয়েছে? মনের গহন গভীরে কতটা নিশ্চিত - কতটা হর্ষিত, কতটা উদ্দীপিত হয়ে থাকতে পারছি?

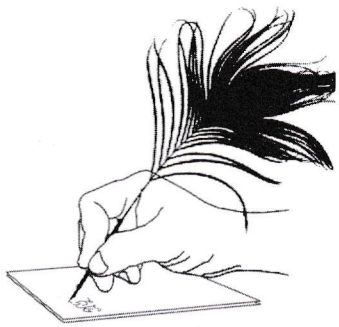

আমাদের সকলের প্রিয় 'প্রভুবার্তা'র তৃতীয় বৎসর অতিক্রান্ত হবার সময় হয়ে এলো। মাত্র ৩০০০ সংখ্যা দিয়ে শুরু করে আজ তৃতীয় বৎসরের প্রায় অন্তে আমরা মাত্র সাড়ে তিনগুণ সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পেরেছি। সম্পাদক হিসাবে, হে বঙ্গভাষাভাষী ভাইবোনেরা, আমরা কিন্তু মোটেই খুশি নই। আট কোটির বেশি সংখ্যাধারী রাজ্যে আমরা ১ লক্ষ 'প্রভুবার্তা' গ্রাহক করতে পারছি না? আপনাদের সানন্দে জানাই 'প্রভুবার্তা' পত্রিকা তার মুদ্রণ, কম্পোজিশন, পেপার কোয়ালিটি, রচনা সম্ভারে মধুবনের বরিষ্ঠ ভাইবোনেদের, দাদি, দাদাদের প্রশংসা আদায় করেছে; আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং স্থানীয় এবং বাংলার বিভিন্ন স্থানের ভাইবোনেদের লেখা বেশি করে প্রকাশ করা। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন অনেক-অনেক যথাযোগ্য লেখার। সমস্ত বঙ্গভাষাভাষী ভাইবোনেদের আমি আহ্বান জানাই - আসুন, বৎসরের শেষে এবং নতুন বৎসরের শুরুতে আমরা সবাই এই শুভ উদ্দেশ্যে যোগদান করি। লেখার উচ্চগুণগত মানের প্রতি মনোযোগ দিয়ে আপনারা সকলে লেখা পাঠান। শুধু তাই নয় আপনাদের সকলের মতামত জানান - কোন্ লেখা কেমন লাগছে, কোন্ লেখা একটু সংশোধন করতে হবে যাতে আমরা আরও ঋদ্ধ হই। একইভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ফটো ও বিবরণ ইত্যাদি পাঠান। মনে রাখবেন, 'প্রভুবার্তা' এখনও দ্বিমাসিক পত্রিকা - একে মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করতে গেলে আরও লেখা পাঠাতে হবে।

আগামী জানুয়ারি মাসেই আমাদের সকলের লক্ষ্যস্বরূপ 'অব্যক্ত দিবস' আসছে - যেদিন স্বয়ং ব্রহ্মাবাবা সম্পূর্ণতা ও সম্পন্নতা প্রাপ্ত হয়ে সমগ্র বিশ্বের সব সন্তানদের আরও বেশি করে পালনা দেবার জন্য নিজেই তিনি তাঁর শরীর অবলীলায় ছেড়ে চলে যান ১৮ই জানুয়ারি, ১৯৬৯ সালে। সমস্ত ব্রাহ্মণ ভ্রাতাভগিনীর সামনে দৃষ্টান্ত রেখে যান আমরা কীভাবে তাঁকে অনুসরণ করব। ইদানীং কালে বাবা সাইলেন্স শক্তির উপর বেশি জোর দিচ্ছেন, কারণ এখন সায়েন্স-এর শক্তিও তার চরমতম শক্তি দ্বারা মনুষ্যকুলের মতিবিভ্রম ঘটানোর জন্য হাজির হয়েছে।

বঙ্গ বিভাজিত হয়েছিল ইংরেজদের মাধ্যমে কিন্তু বর্তমানে বাবার দেওয়া উপহার 'প্রভুবার্তা'র পুষ্টি এবং পালনে, নীরবতায় শুধু লেখনি দ্বারা উভয় বঙ্গকে সংযোজিত করা যায়। আসুন, পূর্বাঞ্চলের ভ্রাতাভগিনীগণ, বৎসরের শেষে সবাই এক মনপ্রাণ দিয়ে আমাদের সকলের প্রিয় 'প্রভুবার্তা'কে উদ্দীপনা ও সৃজনশীল রচনা দ্বারা সমৃদ্ধ করি। সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

- ব্রহ্মাকুমার সমীর

অমৃত সূচি

১। সম্পাদকীয় ১

২। সঞ্জীবনী বুটি ২

৩। ব্রহ্মাবাবা গুরু বা ঈশ্বর নন, ঈশ্বরের মাধ্যম ৩

৪। শান্তির বার্তা ৬

৫। গীতার জ্ঞানদাতা পরমপিতা পরমাত্মা 'শিব' ৭

৬। ঈশ্বরীয় মহান কর্মে আদর্শ দায়বদ্ধতা ৯

৫। প্রশ্ন আমাদের উত্তর দাদিজির ১২

৬। ব্রহ্মপুত্রের সূক্ষ্ম রহস্য ১৪

৭। ব্রাহ্মণ জীবনের পরম্পরা লৌকিক বনাম অলৌকিক ১৫

৮। আদিদেব ১৬

৯। ষোলকলা সম্পন্ন হ'তে ১৮

১০। কালচক্রের নির্দিষ্ট সময়ে ভগবান শ্রেষ্ঠ জীবনশৈলী স্থাপন করেন ১৯

১১। নারী উত্থানে ব্রহ্মাবাবার ভূমিকা ২০

১২। ভরা থাক্ স্মৃতি সুধায় ২৩

১৩। স্বাগত ২০১৫ ২৪

নতুন বাংলা বানান বিধি অনুসৃত

Important Information :
All Email communications for this Bengali Magazine (Prabhubarta) must be sent to **bm@bkprabhubarta.org** only
Phone : 033-2475 3521
033-2474 5251
Annual Subscription : ₹60/-

প্রচ্ছদ পরিচিতি

বর্তমান বিশ্বের যুগপুরুষ প্রজাপিতা ব্রহ্মা যাঁকে মাধ্যম করে ভগবান গীতাজ্ঞানের দ্বারা স্বর্ণযুগ বা নতুন দুনিয়া স্থাপন করছেন, তিনি সকলকে নিরাকারী, নির্বিকারী ও নিরহঙ্কার হতে বলছেন।

সঞ্জীবনী বুটি

বাপদাদা মাটি থেকে তুলে সিংহাসনে বসিয়েছেন, তাহলে সিংহাসনে ছেড়ে মাটিতে নেমে কেন খেলছ? দেহভানে আসা মানেই মাটি নিয়ে খেলা। সঙ্গমযুগ উপরে চড়ার সময়, নামার সময় সমপ্ত হয়েছে। অতএব সদা উপরেই থাকো।

ব্রহ্মাবাবা গুরু বা ঈশ্বর নন, ঈশ্বরের মাধ্যম

দাদা লেখরাজের অন্তরের পরিবর্তনের কাহিনি জুড়ে আছে ১৯৩৬-৩৭ বর্ষের সঙ্গে, সময়টা আরো তাৎপর্যপূর্ণ এজন্য যে ভারত ওই সময় স্বাধীনতার জন্য মরণপণ লড়াই করছিল। ভারতবাসী রাজনৈতিক শত্রুদের বিরুদ্ধে তো লড়ছিলই কিন্তু এমনও প্রতীত হচ্ছিল যে কামবাসনা, আসক্তি, লোভ, ক্রোধ, অভিমান-এর কোন-না-কোনটার সঙ্গে মানুষ হয় সমঝোতা করে নিয়েছে কিংবা এসবের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছে। ধর্মের নামে তো কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস ছিলই। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল অধিক শক্তিশালী হাতিয়ার রূপে ঘৃণা ও হিংসার অভিব্যক্তি, যা ভিতরে ভিতরে তৈরি হচ্ছিল বিশ্বযুদ্ধের এক ভয়ানক প্রেক্ষাপট। অস্বীকার করার উপায় নেই ওই সময়ে কার্লমার্কস ও ফ্রয়েডের বিচারধারা 'আধ্যাত্মিক' বিচারের উপর ভীষণ প্রভাব ফেলেছিল। বিশ্বময় এক গভীর সংকট দেখা দিয়েছিল। এই সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের আবশ্যক হয়ে পড়েছিল।

এই পরিবর্তন কার পক্ষে সম্ভব?

বিল ডিয়ুর‍্যান্ড বলেছিলেন, মানুষের মন বড় ঠুনকো খুব সহজেই দুঃখী হয়ে যায়, সুতরাং সে সৃষ্টির রহস্য কেমন করে বুঝবে? এজন্যই ঈশ্বর, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। তাঁর পক্ষেই সৃষ্টি রহস্যের ব্যাখ্যা দেওয়া ও মানুষকে বোঝানো সম্ভব। ঈশ্বরেরও এই মহানতম কর্মের জন্য প্রয়োজন হল ব্রহ্মাবাবার মত একজন মহৎ ব্যক্তির।

দাদা লেখরাজ যিনি পরবর্তীকালে ব্রহ্মাবাবা রূপে পরিগণিত হন তিনি হায়দরাবাদ সিন্ধের (যা বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত) এক উপনগরে একজন প্রধান শিক্ষকের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যবসায়িক দক্ষতা, অপরকে সহজে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা ও মানসিক উদ্দামতা এই ত্রয়ীর সংমিশ্রণে পরবর্তীকালে তিনি এক নামজাদা সফল জহুরি রূপে নিজেকে প্রতিভাত করেন। কলকাতা ও মুম্বাইয়ে তাঁর ব্যবসায়ের মূলকেন্দ্র ছিল। তাঁর সহজাত স্নেহশীল স্বভাবের জন্য সবাই তাঁকে সম্মান ও ভালোবাসামাখা শব্দ 'দাদা' বলে সম্বোধন করতেন।

তিনি ধনী হলেও অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীনারায়ণের তিনি একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন এবং প্রত্যেকদিন গীতা পাঠ করতেন। রেলযাত্রাকালীনও তাঁর এই পাঠের নিয়মের ব্যতিক্রম হত না। বহু তীর্থক্ষেত্র ভ্রমণ করেছেন বেনারস, অমরনাথ সহ অন্যান্য তীর্থস্থানে। এজন্য তিনি ছুটে গেছেন কারণ তাঁর অন্তর্মন সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য লালায়িত ছিল। অমরনাথ দর্শনে গিয়ে এক পূজারিকে তিনি অকপটে প্রশ্ন করেছিলেন, এখানকার শিবলিঙ্গ কি আপনা হতেই তৈরি হয় নাকি কোন মানুষ তৈরি করে? না, তিনি অন্ধবিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর সত্যানুসন্ধানী মন সত্যকে খুঁজে বেড়াত। কোন রাজা বা রাজকুমার তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করলে তিনি তাঁদের সাত্ত্বিক আহার পরিবেশন করে অতিথি সৎকার করতেন। মদ ও মাংস থেকে তিনি দূরে থাকতেন।

একবার এক অতিথি, ভোজনে মদ ও মাংস না পেয়ে বলেছিলেন, আজ ভোজন বিরস ও বিস্বাদ হল। দাদাও রসিকতা করে বলেছিলেন, কাগজের নোটের বদলে কিন্তু তিনি উজ্জ্বল রত্ন ও হিরে দেন এজন্যই তিনি তার একান্ত সিদ্ধান্ত বদলে বাধ্য নন। তিনি এক প্রবাদ বাক্যে বিশ্বাসী ছিলেন, ''ধরত পরিয়ে পর ধর্ম না ছোড়িয়ে'' অর্থাৎ যদি আমার মৃত্যুর ভয়ও হয় তবুও আমি নিজের ধর্মীয় চেতনাকে হনন করব না। নিজের নৈতিক সিদ্ধান্তে অটল থাকব।

দাদার হৃদয়ে নারীদের জন্য বিশেষ মর্যাদার স্থান ছিল। নিজের সহধর্মিণীর প্রতি ছিল অগাধ স্নেহ ও সম্মান। নারীদের প্রতি সম্মানের তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ; শ্রীলক্ষ্মী নিজ হাতে শ্রীনারায়ণের পদসেবা করছেন এই দৃশ্য তিনি মনে প্রাণে অপছন্দ করতেন। যদিও দাদা নিজে শ্রীনারায়ণের একান্ত ভক্ত ছিলেন। তথাপি দাদার দৃষ্টিতে এই দৃশ্য নারীদের দাসীবৃত্তির প্রতীক। দাদা কোন এক চিত্রকরকে ডেকে আদেশ দিলেন এই দৃশ্য থেকে শ্রীলক্ষ্মীকে সরিয়ে দিয়ে তাঁকে মুক্ত করে দিতে।

"হে প্রভু, এই দৃশ্য এতখানি ভয়ংকর যে আমি সহ্য করতে পারছি না। নিশ্চয় এটাই বিনাশ। হে প্রভু, হে স্বামী, আমাকে আপনি সুখপ্রদানকারী এবং আনন্দদায়ী রূপ দর্শন করান, এসব আর বেশি দেখতে পারছি না।''

একদিন দাদা আত্ম-চিন্তনের গভীরে ডুব দিয়েছেন, নিজেকে এই ভৌতিক জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত অনুভব করছেন, তিনি বিনাশের অনেক রকম ভয়ংকর দৃশ্য দেখলেন। তিনি দেখলেন প্রলয় ও ভূমিকম্পের জন্য অসংখ্য নরনারী ও শিশুর প্রাণহানি হচ্ছে, চরম পরিণতির জন্য মানুষ রক্তের খেলায় মেতেছে, গৃহযুদ্ধে একজন আর একজনের প্রাণ অবলীলায় কেড়ে নিচ্ছে। পারমাণবিক বোমার মহাবিস্ফোরণে প্রজ্বলিক্ষ্ম মহাজ্বালায় এক পলে বিশ্বের এক বিশাল ভাগকে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। এসব দৃশ্যাবলি দেখে দাদা অত্যন্ত ভীত হয়ে আর্তচিৎকারে বলে উঠলেন - ''হে প্রভু, এই দৃশ্য এতখানি ভয়ংকর যে আমি সহ্য করতে পারছি না। নিশ্চয় এটাই বিনাশ। হে প্রভু, হে স্বামী, আমাকে আপনি সুখপ্রদানকারী এবং আনন্দদায়ী রূপ দর্শন করান, এসব আর বেশি দেখতে পারছি না।'' এক লহমায় দৃশ্য বদলে তাঁর সামনে নতুন এক দৃশ্য উপস্থিত হল। তিনি 'চতুর্ভুজ বিষ্ণু' দেখলেন। এক বাণী শুনলেন - ''আমি চতুর্ভুজ বিষ্ণু আর তুমিও তাই (অহং চতুর্ভুজ বিষ্ণু তৎত্বম্)। ইহার অর্থ হল - তোমার মূলরূপে তুমি আত্মা, স্বর্গরাজ্যের তুমি এক দেবতা - শ্রীনারায়ণ ছিলে।'' ইহা দাদার প্রতি এক আহ্বান ছিল, জাগো, নিজের আধ্যাত্মিক স্বরূপের উচ্চতম কুলকে প্রাপ্ত করো।

একদিন এক বিশেষ ঘটনা ঘটল, দাদার গৃহেই এক জ্ঞানী সন্তের প্রবচন চলছিল। কিন্তু দাদার অন্তর্মনে ইচ্ছা হল এখান থেকে উঠে তিনি একান্তে চলে যান, মনে হল ঈশ্বরের ডাক আসছে। প্রবচন চলাকালীন দাদা উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের সাধনা কক্ষের দিকে চলে গেলেন। যদিও বিষয়টি ছিল তাঁর নিজস্ব পালনীয় নিয়ম মর্যাদা বিরুদ্ধ। তাই এই ব্যতিক্রমী ঘটনা দেখে দাদার ধর্মপত্নী যশোদা এবং পুত্রবধূ বৃজইন্দ্রা (ওই সময় তাঁর নাম ছিল রাধা) বেশ অবাক হয়ে তাঁর পিছু নিলেন। তাঁরা উভয়ই দাদার সাধনা কক্ষে দেখ লেন, দাদার নেত্রে উজ্জ্বল আভা, মুখমণ্ডল থেকে অবিরল দিব্য প্রকাশের স্ফূরণ সারা কক্ষে আবৃত করে ফেলেছে। তাঁদের দুজনেরই অনুভব হল, তাঁরা দেহভান থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেছেন এবং দাদার মধ্যে দিব্যশান্তির অবতরণ হয়েছে। পরম শান্তির বাতাবরণে পূর্ণ দাদার মুখ থেকে স্বতঃই ঈশ্বরের বাণী নিঃসৃত হচ্ছে ঃ

"নিজ আনন্দ স্বরূপম্ / শিবোহম্ শিবোহম্
জ্ঞান স্বরূপম্ / শিবোহম্ শিবোহম্
প্রকাশ স্বরূপম্ / শিবোহম্ শিবোহম্"
এর অর্থ হল - "আমি আনন্দময় স্বরূপ / আমিই শিব, আমিই শিব
আমি জ্ঞানময় স্বরূপ / আমিই শিব, আমিই শিব
আমি প্রকাশময় স্বরূপ / আমিই শিব, আমিই শিব"

নিরাকার সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ এই সৃষ্টির মালিক ভগবান 'শিব' দাদা লেখরাজের শরীর রূপী রথে অবতরণ করে তাঁর মাধ্যমে নিজের পরিচয় দিয়েছেন যা এ পর্যন্ত সমস্ত অনুভবের অতীত। এখন থেকে দাদা লেখরাজ পরিণত হলেন ভগবান 'শিব'-এর মাধ্যম এবং সাধন (Instrument)। দাদার মাধ্যমে ভগবান 'ঈশ্বরীয় জ্ঞান' দান করতে লাগলেন। যে জ্ঞান দাদা লেখরাজের কাছেই শুধু নতুন নয় সকলের কাছেই নতুন জ্ঞান রূপে প্রতিভাত হল। এই সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চে দাদা লেখরাজের ভূমিকার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। তাঁর শরীররূপী রথে ভগবানের অবতরণের জন্য তিনি হয়ে গেলেন 'ভাগ্যশালী রথ' বা 'ভগীরথ'। এই সৃষ্টিকে পরিবর্তনের জন্য ভগবান শিব তাঁকে জ্ঞানদানের নিজের মাধ্যম করে তাঁর নতুন নামকরণ করেন পিতাশ্রী প্রজাপিতা ব্রহ্মা। তিনি 'ব্রহ্মাবাবা', সকলের অলৌকিক পিতা রূপে পরিচিত হলেন।

এই সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চে দাদা লেখরাজের ভূমিকার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। তাঁর শরীররূপী রথে ভগবানের অবতরণের জন্য তিনি হয়ে গেলেন 'ভাগ্যশালী রথ' বা 'ভগীরথ'।

এরপরে ব্রহ্মাবাবা হায়দরাবাদ-সিন্ধে 'জশোদা নিবাস' নামক নিজের বাসভবনে ১৯৩৬ সাল থেকে নিয়মিত 'সৎসঙ্গ' বা ধর্মীয় সভা শুরু করেন। ওই সময় ধর্মীয় সভা এক পারিবারিক রূপে ছিল, বহু মানুষ আসতে থাকল। কোন এক অমোঘ আকর্ষণ তাদের টেনে নিয়ে আসত। ব্রহ্মাবাবা সকলকে পূর্ণ পবিত্র জীবন ধারণের প্রেরণা দেন। কামনা বাসনা নিকৃষ্টতম মন্দ, আর দেহ-অভিমান সকল মন্দের 'মূল' বলে তিনি অভিহিত করেন। এই সভাতে এসে সকলে পবিত্র ওম্ ধ্বনি উচ্চারণ করতেন, এজন্য এই সৎসঙ্গকে সকলে 'ওম্ মণ্ডলী' বলে সম্বোধন করতে লাগল। এই সৎসঙ্গে নারী-পুরুষ -শিশু সকলের প্রবেশ অবাধ ছিল। এদের মধ্যে 'ওম্ রাধে' নামে সর্বাধিক প্রতিশ্রুতি-সম্পন্না এক কিশোরী ছিল। পরবর্তী সময়ে যিনি 'আধ্যাত্মিক মাতা' রূপে প্রতিষ্ঠিতা হন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ধারণায়, যোগে, পবিত্রতার উচ্চতায় এবং সেবা ও পালনের আদর্শ রূপের জন্য তিনি 'জগদম্বা সরস্বতী' নামে পরিচিতা হন।

১৯৩৭ সালের অক্টোবরে ব্রহ্মাবাবা কন্যা ও মাতাদের নিয়ে এক পরিচালন সমিতি গঠন করেন। ১৯৩৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারিতে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি এই সংগঠনের একটি ট্রাস্টের নামে নামাঙ্কিত করে দেন। দেখতে দেখতে দেশ বিভাজন হয়ে গেল। করাচী পাকিস্তানে রয়ে গেল। ১৯৫১ সালে ভারতীয়দের আমন্ত্রণে এই সংস্থা ভারতের রাজস্থান রাজ্যের মাউন্ট আবুতে স্থানান্তরিত হল। সংস্থার সেবাকার্যও ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে লাগল। ১৯৬৫ সালের ২৪ জুন মাতেশ্বরী সরস্বতী তাঁর পার্থিব শরীর ত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে সেবার গতি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ঈশ্বরীয় সন্দেশ দূর-দূরান্তে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ সমর্পিত ভাইবোনদের নিয়ে বিভিন্ন বর্গ গঠন করা হয়েছে। এই বর্গের অধিকাংশই হলেন বোনেরা। যাঁদের ব্যবহারিক জীবনে

পবিত্রতার ঝলক প্রতিবিম্বিত যা সত্যযুগে স্বতঃই পরিলক্ষিত হবে। বর্গের বিভিন্নরূপ কার্যাবলি চলতে থাকল। বিভিন্ন কার্যক্রমের আয়োজন করা, সেবা, কেন্দ্র সঞ্চালন করা, স্ব-উন্নতির প্রেরণাদায়ী ভাষণ করা, আধ্যাত্মিকতায় শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদের আধ্যাত্মিকতার প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ করা, নিজের আধ্যাত্মিক অন্বেষণে স্থিত হওয়া। এঁরা সবাই অতীব উৎকৃষ্ট, গুণী ও যোগযুক্ত আত্মায় রূপান্তরিত হয়েছে। ব্রহ্মাবাবার মনে হয়েছে তাঁর দীর্ঘ ৩৩ বছরের সাধনা ও ক্লান্তিহীন নিরলস প্রয়াস এই সংগঠনের প্রথম পর্বের লক্ষ্যপূরণ হয়েছে। এবার পটপরিবর্তনের প্রয়োজন। সংগঠনের বিশাল কর্মভার নিজের কাঁধ থেকে সরিয়ে অন্যদের সঁপে দেওয়ার সময় হয়েছে। এই দায়িত্বভার পেলে সেবার বিশাল ক্ষেত্রে তাদেরও অধিক অনুভব হবে।

যজ্ঞের শুরুতে সিন্ধ-হায়দরাবাদের কথাই ধরুন, স্রেফ পবিত্রতার কারণেই কোর্ট-কেস হ'ল, পিকেটিং হ'ল, কত বিরোধিতা হ'ল, তো এসব সমস্যা ব্রহ্মাবাবা রাস্তা বের করে দূর করেছেন।

১৯৬৯ সাল, ১৮ জানুয়ারি রাতের ক্লাস তিনি সমাপন করেছেন, নিজের কক্ষে এসেছেন তার কয়েক মিনিট পরেই তাঁর নিজের নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। যারা তাঁর নিকটে ছিলেন তাদের বেশ কিছু সময় আগে থেকে অনুভব হয়েছে, ব্রহ্মাবাবা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত করে নিয়েছেন এবং অনাসক্ত ভাব প্রকট। তিনি যেন সশরীরে নামমাত্র আছেন। তাঁর মুখমণ্ডল থেকে প্রগাঢ় আভা সদা বিচ্ছুরিত হত। আর মস্তকের চতুর্দিকে দেদীপ্যমান প্রভামণ্ডল আবৃত থাকত। ভৌতিক রূপে বাবার যা করণীয় ছিল তা তিনি সম্পন্ন করে অস্তিত্বের এক উচ্চতর স্তরে পৌঁছে গেছিলেন। তিনি আলোর শরীর নিয়ে দেবদূতে পরিণত হয়েছেন ফলস্বরূপ তিনি স্থূল বা ভৌতিক রূপের সঞ্চরণ থেকে মুক্ত। এই অবস্থানের জন্য তাঁর সেবার শক্তি লাখো গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেবদূত রূপে ব্রহ্মাবাবার অবস্থান দেবদূত লোকে বা সূক্ষ্মলোকে হলেও নিরাকার শিবাবাবার সাথে গাঁটবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিশ্বের যে কোন প্রান্তে ক্ষণিকের মধ্যে চলে যান এবং অসংখ্য মানব-আত্মাকে ঈশ্বরীয় জ্ঞান, পবিত্রতা ও শান্তি প্রদান করে চলেছেন। শিববাবা ও ব্রহ্মাবাবাকে একত্রে আমরা 'বাপদাদা' রূপে জানি, তাঁরা উভয়ই বর্তমানে নিরলস ভাবে স্বর্ণযুগ বা সত্যযুগ স্থাপনের কাজ পূর্ণ উদ্যমে করে চলেছেন।

শান্তির বার্তা

- ব্রহ্মাকুমার সোমনাথ
দুর্গাপুর

রক্ত-মাংসের গড়া এই শরীর নই, আমরা দেবীদেবতা
এই ক্লান্তি, শ্রম মানুষকেই দেয় দেহ অভিমানের বার্তা।
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ বিলাস ব্যসন
এসবেই মানুষ করে দিবানিশি যাপন
আসল সত্য তা নয় বৎস সত্যিই মোরা দেবীদেবতা
একটু ভাবনা বিচার কর ভাই সব
কেমনে সহজ রাজযোগে যায় আসা।
ষড়রিপুর বশে মানুষ, সবাই যখন পরাজিত
সুখের মালা গলায় আছে, তবুও খোঁজে অহরহ
ইন্দ্রিয়জিৎ আমরা সবাই, সবাই হব ফরিস্তা।
যোগ শক্তির প্রকম্পন, শান্তি, প্রেম ও পবিত্রতায় খুলব মোরা স্বর্গদ্বার
মোদের একমাত্র চিন্তা হবে পরমপিতা পরমাত্মা আর পরোপকার।

গীতার জ্ঞানদাতা পরমপিতা পরমাত্মা 'শিব'

- ব্রহ্মাকুমারী মঞ্জুশ্রী
রায়বাগান, কলকাতা

শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ভগবানের মধুর বাণী। গীতাকে সর্বশাস্ত্রের শিরোমণি বলা হয় কারণ সমস্ত বেদ-উপনিষদের সার এই গীতা। গীতাতে ভগবান উবাচ আছে, কোথাও শ্রীকৃষ্ণ উবাচ নেই। গীতায় কোথাও হিন্দু শব্দ নেই বরং সব ধর্মের মর্যাদা সমানভাবে সুরক্ষিত। গীতাই একমাত্র শাস্ত্র যার বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের মনোদিশা সঠিক পথে চালনা করার জন্য ভগবান অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন বা জ্ঞান দিয়েছিলেন তাই গীতা।

বর্তমানে সারা বিশ্ব এক অস্থির অনিয়শ্চয়তার মধ্যে দিয়ে চলেছে। সংসারের প্রতিটি মানুষ এখন অশান্ত, অসুখী, নিরানন্দ, ভীত - এক অজানা ভয়ে সর্বদা আতঙ্কিত। ঘরে ঘরে এখন ছোট থেকে বড় সবাই মানসিক রোগের শিকার। মানসিক চাপ, অবসাদ, হতাশা এখন ঘরে ঘরে। কীভাবে এই ভয়ানক পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে, কীভাবে সব সমস্যার সমাধান করবে, কিছুই সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারছে না, অর্থাৎ 'জীবনযাপনের কলা' বা Art of living তার জানা নেই। যদি গীতা সঠিক ভাবে অধ্যয়ন করা যায় তাহলে মনের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। অস্থিরতা, ভয় থেকে মুক্তি, মনের সমস্ত দুর্বলতা দূর করে শক্তিশালী হওয়া যায়, শান্তি পাওয়া যায়।

কথিত আছে, একদিন ব্যাসদেব যখন ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তাঁর দিব্য সাক্ষাৎকার হয়েছিল, তিনি ভগবানের মহাবাক্য শ্রবণ করছিলেন। ধ্যানের শেষে তিনি স্থির করলেন মানব সমাজের কল্যাণহেতু তিনি তা লিপিবদ্ধ করবেন। কিন্তু লিখতে বসে তিনি সবকিছু ঠিকঠাক মনে করতে পারলেন না। কিছু ভুলে গেলেন। কাজেই প্রথম দিন তিনি যা লিখ লেন তার মধ্যে নিজের কল্পনাও কিছু মিশে গেল। দ্বিতীয় দিন তিনি ঠিক করলেন নিজে লিখবেন, কিন্তু ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখতে আর শুনতে এতই মগ্ন হয়ে গেলেন যে পুরোটা লিখতে পারলেন না। তখন তিনি ঠিক করলেন গণেশকে নিয়ে বসবেন। গণেশ রাজি হলেন লিখতে, কিন্তু শর্ত দিলেন, আপনি যদি বলতে বলতে থেমে যান আমিও থেমে যাব, আর লিখব না। ব্যাসদেব যথারীতি ধ্যানে মগ্ন হলেন। তৃতীয় দিনের ভগবান উবাচ খুবই রহস্যময় ছিল। তাই তা বুঝে নিয়ে গণেশকে একটানা বলতে পারলেন না। থেমে যেতে লাগলেন। কাজেই তৃতীয় দিনেও পুরোপুরি সঠিক লেখা হল না। ভাবার্থ হচ্ছে, ব্যাসদেব রচিত মহাভারত কতটা সঠিক আর কতটা কল্পনাপ্রসূত - ভাববার বিষয়। বিভিন্ন ভাষায় যাঁরা গীতা অনুবাদ করেছেন, তাঁরা নিজের নিজের দৃষ্টিকোণ দ্বারা বোঝবার চেষ্টা করেছেন এবং যে রকম বুঝেছেন তেমনই অনুবাদ করেছেন।

মান্যতা আছে মহাভারত দ্বাপর যুগে লেখা হয়েছিল। তাহলে ভগবানের এই সত্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান পাওয়ার পরও এই কলিযুগ অর্থাৎ এই কলহ-ক্লেশের যুগ, অজ্ঞান-অন্ধকারের যুগ কলিযুগ হওয়ার কথা নয়, সুখ-শান্তির যুগ হওয়ার কথা। ভগবানের মহাবাক্য অনুসারে এই অন্ধকারের যুগ শেষ হয়ে নতুন যুগ অর্থাৎ সত্যযুগ আসার কথা, যেখানে সকল মানব হবে দেব সমান।

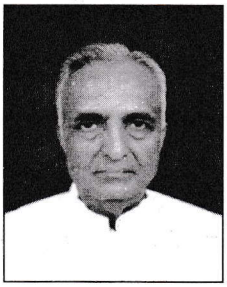

ঈশ্বরীয় মহান কর্মে আদর্শ দায়বদ্ধতা

- ব্রহ্মাকুমার রমেশ শাহ
মুম্বাই (গামদেবী)

আমরা সবাই জানি এই বিশ্ব বিদ্যালয় এক বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও বটে। এখানে ভবিষ্যতের ভাবী বিশ্ব প্রশাসক হতে যাওয়া সৌভাগ্যশালী ভাইবোনদের পরমাত্মা অধ্যয়ন করাচ্ছেন, বিশেষ প্রশিক্ষণও দিচ্ছেন। এ-প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য বিষয় হল, ভবিষ্যতে যিনি বিশ্ব প্রশাসকের দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন তাঁকে অবশ্যই তিনটি শংসাপত্র অর্জন করতেই হবে। যথাক্রমে তা হবে 'স্ব-প্রিয়', 'লোকপ্রিয়' ও 'প্রভুপ্রিয়'। লোকপ্রিয় হওয়া তো ভীষণ আবশ্যক কারণ এখানে নিজের মধ্যে এই সংস্কার আয়ত্তের উপরই ভবিষ্যতের দায়িত্ব বর্তাবে। লোকপ্রিয়র প্রসঙ্গে প্রবাদ আছে - ''রাম রাজা, রাম প্রজা.....এরূপ নগরী..... যতদিন দাতা বাঁচে ধর্মের উপকার....। ভবিষ্যতে যিনি বিশ্ব মহারাজা হবেন তিনি এতটাই লোকপ্রিয় হবেন যে সমস্ত প্রজা তাঁকে নিজের পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও অভিভাবক জ্ঞান করবেন। প্রজার প্রতি তাঁর বিশেষ নজর থাকবে। আমরা এখন সঙ্গমযুগে বলে থাকি 'আমার বাবা', 'প্রিয় বাবা', 'মিঠাবাবা' - ঠিক ওরকমই সত্যযুগে প্রজারা রাজাকে নিয়ে বলবে, 'আমার রাজা', 'প্রিয় রাজা', 'মিঠা রাজা'। ওখানে প্রজার প্রত্যেকটি কাজে রাজার পূর্ণাঙ্গ সহায়তা থাকবে।

অনেক পুরনো যুগ দ্বাপর। এখানে রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রসঙ্গে বলা হয় তিনি প্রজার দুঃখভঞ্জনকারী ছিলেন। তিনি প্রজার বিভিন্ন সমস্যা ও দুঃখ দূর করার সহযোগী ছিলেন। এরকম কিছু রাজার কথা শোনা যায় যাঁরা নিজের বেশ বদল করে রাতের বেলা নিজের রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিচরণ করতেন সুখদুঃখের হালহকিকত জানতে। সেই মোতাবেক প্রজার কল্যাণে তিনি ব্যবস্থা নিতেন। রাজা ও রাজকর্মচারীগণ প্রজাকে রক্ষা করার কার্য করতেন এর ফলে প্রজারা সুখশান্তিতে জীবন কাটাতেন। এজন্য শাস্ত্রেও গায়ন করা হয়েছে, প্রজারা নিজের রাজাকে পিতৃসম জ্ঞান করে তাঁকে সম্মান করতেন।

মহাকবি কালিদাস 'রঘুবংশ'তে খুব সুন্দর করে রঘুবংশের রাজাদের মহিমা তুলে ধরেছেন। রঘুবংশের রাজা নিজের প্রজার নিকট থেকে কোন প্রকার খাজনা আদায় করতেন না। কিন্তু প্রজা স্বেচ্ছায় তার বেঁচে যাওয়া অধিক ধন রাজকোষে জমা করত আর অতিরিক্ত শস্য রাজভাণ্ডারে প্রদান করত। রাজকোষ যখন পরিপূর্ণ হয়ে যেত তখন রঘুরাজ ঘোষণা করতেন, যার যেমন ধনের প্রয়োজন সে যেন এসে রাজকোষ থেকে নিয়ে যায়।

সত্যযুগী শ্রেষ্ঠ দুনিয়ার রাজকার্য সম্বন্ধে গায়ন আছে, ওই সময় রাজসিংহাসনে আসীন থাকেন শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীনারায়ণ, যাঁদের আজ পর্যন্তও মন্দিরে এবং ঘরে পূজা করা হয় ওই সময় তাহলে প্রজাদের কাছে তাঁরা কতখানি শ্রদ্ধার ও পূজ্য ছিল! আদর্শ রাজত্বে আবশ্যিক শর্ত হল রাজা প্রজাদের প্রিয় হবেনই। অর্থাৎ তিনি লোকপ্রিয় হবেনই। বর্তমান দুনিয়ায় ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়। এই নির্বাচন ক্ষেত্রবিশেষে চার বছর কিংবা পাঁচ বছর অন্তর হয়ে থাকে। আজ জনগণের দ্বারা কেউ নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় বসলেন, কাল হয়তো অন্য কেউ বসবেন। এর ফলে শাসন ব্যবস্থার ধারা ঠিক থাকে না। নির্বাচনের আগে কোন এক রাজনৈতিক দল অন্য প্রতিপক্ষ দলের বিরুদ্ধাচারণ করতে গিয়ে অশালীন, অশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ করে প্রচার করে জনগণের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে থাকে। দেখা যায় শতকরা ২৫-৪০ জন এমন নেতা আছেন যাঁদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা চলছে। আমজনতা ঘোর দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় কাকে নির্বাচন করবে? যাদের ভাষার ধরন

এরকম, যাদের বিরুদ্ধে অসামাজিক কাজের জন্য মামলা, এরা প্রশাসনে গিয়ে কাদের কল্যাণ করবে? কাকে নির্বাচিত করব? এ প্রসঙ্গে আমি একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। মুম্বাইয়ে আমাদের সেবাকেন্দ্রে এক পুলিশ অফিসার আসতেন। তিনি জানিয়েছেন তার জেলে এক নেতার বন্দির আদেশ হয়, জেলবন্দি অবস্থায় তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হন, নির্বাচনে লড়াই করে তিনি বিধায়ক পদে জিতে নির্বাচিতও হন। কিন্তু বিড়ম্বনার বিষয় কী জানেন, ওই ব্যক্তি জেলে থাকাকালীন আমাকে স্যালুট করত সেই ব্যক্তি বিধায়ক হওয়ার পর আমায় তাকে স্যালুট করতে হয়। ভাবুন, বর্তমান সময়ের কী অদ্ভুত নিয়মরীতি!

সত্যযুগের রাজকার্য এরকম হবে না, ইহা বোঝার জন্য ভগবানের প্রদত্ত জ্ঞান সমাজবাদের বিষয় আমাদের জানতে হবে। বর্তমান দুনিয়ায় নির্বাচন হয়, আর এই নির্বাচনে জনমতের গরিষ্ঠতা যে পায় সেই রাজকার্য পরিচালনা করে। ভগবানের নির্বাচনের কার্যাবলি সঙ্গমযুগেই হয়ে থাকে। ভগবান সবাইকে একই 'জ্ঞান' দেন, একই 'রাজযোগ' শেখান এবং বলেন, তুমি তোমার নিজের ভাগ্যবিধাতা, আমি তোমার ভাগ্য তৈরি করে দিই না, তুমি তোমার পুরুষার্থ অনুযায়ী ভাগ্য নির্মাণ করো। কেউ কারুর ভাগ্য নির্মাণ যেমন করতে পারেনা তেমনি ধ্বংসও করতে পারেনা। অর্থাৎ ভগবান শিববাবা প্রত্যেককে ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ রাজপদ অর্জনের গোল্ডেন লটারি প্রদান করেন। সঙ্গমযুগ এক নির্বাচন ক্ষেত্র যেখানে আমরা নিজেদের পুরুষার্থ অনুযায়ী ভবিষ্যতের রাজ্যের অধিকারী হই। এজন্য শিববাবা বলেন, যে করবে সে পাবে। আমাদের সকল ব্রহ্মাবৎসকে শিববাবা এই জ্ঞান দিয়েছেন কিন্তু আমরা নিজের নিজের চলমান ধারাবাহিক জীবনধারা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, নানারকম উদ্ভুত সমস্যার জালে আটকে যাই। ভবিষ্যতের নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য নির্মাণে নিজেকে বঞ্চিত রাখি। সাকার বাবা সব সন্তানদের জানিয়ে ছিলেন, যদি তোমার নিকট পরিবার পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত ধন থাকে তাহলে আর বেশি ধন উপার্জনের পিছনে না পড়ে ঈশ্বরীয় সেবায় লেগে যাও। নিজের ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য নির্মাণের পুরুষার্থে আন্তরিক হও।

যদি তোমার নিকট পরিবার পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত ধন থাকে তাহলে আর বেশি ধন উপার্জনের পিছনে না পড়ে ঈশ্বরীয় সেবায় লেগে যাও। নিজের ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য নির্মাণের পুরুষার্থে আন্তরিক হও।

মনে পড়ে আমি একবার মধুবনে আছি, ব্রহ্মাবাবা বললেন, যদি কোন বাচ্চা জিজ্ঞাসা করে - যদি আজই আমার শরীর ত্যাগ হয় তাহলে ভবিষ্যতে আমার কী পদ হবে? বাবা জানিয়ে দেবেন। একথা শুনে আমি বাবাকে বললাম, বাবা, আজ আপনার সামনে লম্বা লাইন পড়ে যাবে। বাবা বললেন, বাছা, বাবার কাছে কেউ আসবে না। কারণ প্রত্যেকে নিজের বর্তমান পুরুষার্থ স্থিতি অনুসার জানে তার কী পদ হতে পারে। প্রত্যেকের স্বভাব-সংস্কারের বন্ধন কিংবা অন্য কোন বন্ধন আছে যার ফলে কষ্টসাধ্য করে চলতে চাইলেও সবাই ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্তির পুরুষার্থ করতে পারবে না। অন্তিমে সবার অনুভব হবে, সঙ্গমযুগে আমার বিশাল সুযোগ এসেছিল কিন্তু সেই সুযোগ আমি কাজে লাগাইনি এজন্য শ্রেষ্ঠ পদের অধিকারী হইনি। একারণেই সত্যযুগে রাজার প্রতি প্রজার মনে ঈর্ষা বা দ্বেষভাব উৎপন্ন হবে না। রাজা ও প্রজা নিজেদের মধ্যে সম্মান ও শ্রদ্ধার ভাব থাকবে।

একে অপরের প্রতি সম্মান এবং সমভাব দেখানো শিখিয়েছেন আমাদের প্রিয় ব্রহ্মাবাবা, মাম্মা ও দাদি প্রকাশমণিজি, তারই ফলশ্রুতি আমাদের এই বিশ্ব বিদ্যালয়ের ৭৭ বছর পূর্ণ করা। জ্ঞানামৃত পত্রিকায় আমি একবার এক হাসির কথা লিখেছিলাম, যদি দাদি প্রকাশমণি আর আমি নির্বাচনে দাঁড়াই তাহলে সকলের ভোট দাদি প্রকাশমণিজির দিকেই পড়বে

আর আমার নিজের ভোট, সেও দাদিই পাবেন। আজকের কম্যুনিস্ট দেশে কেবল একজনই প্রতিনিধিই নির্বাচনে দাঁড়ান, সবাই তাকে ভোট দেন এবং ঘোষণা করা হয় ওই প্রতিনিধি নির্বিরোধ নির্বাচিত। কিন্তু বাবার যজ্ঞে এরূপ হয় না। দাদি প্রকাশমণিজি যদি শতকরা একশ ভাগ ভোট পেয়ে নির্বিরোধ নির্বাচিত হন তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় মানুষ দাদিজির লোকপ্রিয়তা ও গুণের নিরিখে নিজের ভোট দাদিকে দিয়েছেন। ইহাতে একটি বিষয় সিদ্ধ হয় আমাদের শ্রেষ্ঠ ভবিষ্যৎ আজ যে বর্তমান তারই উপরে হয়ে থাকে। আমাদের প্রিয় বাবা, মাম্মা ও দাদিরা এতটাই মানুষের পছন্দের অর্থাৎ লোকপ্রিয় যে আমরা নিজেরাই তাঁদের উপর ভবিষ্যতের রাজ্যভার খুশি-খুশিতে দেব।

নভেম্বর, ১৯৬৮ সালে প্রিয় ব্রহ্মাবাবার মার্গদর্শন অনুযায়ী 'ওয়ার্ল্ড রিন্যুয়াল স্প্রিচুয়াল ট্রাস্ট' তৈরির তোড়জোড় চলছে। আমি এই সমাচার শ্রদ্ধেয় জগদীশ ভাইকে দেবার জন্য পত্র লিখছিলাম। ওই সময় ব্রহ্মাবাবা উপস্থিত হলেন, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাছা কী করছ? আমি বাবাকে বললাম, বাবা 'ওয়ার্ল্ড রিন্যুয়াল স্প্রিচুয়াল ট্রাস্ট' তৈরির সংবাদ জগদীশ ভাইকে লিখছিলাম। বাবা আমাকে বললেন, এ কাজ তুমি ছাড়, বাবা নিজেই তাঁকে সংবাদ দেবেন। তুমি মুম্বাই যাও আর ট্রাস্টের রেজিস্ট্রির বন্দোবস্ত করো। বাবার শ্রীমৎ মতো আমি আর প্রকাশমণি দাদিজি মুম্বাই গেলাম। রেজিস্ট্রেশনের কাজ যখন চলছে তখন বাবা প্রত্যেকদিন এবিষয়ে সবকিছু আমাকে অভিজ্ঞতা দিতে থাকলেন আর আমি সেই হিসাবে ট্রাস্টের সঞ্চালন করতে থাকলাম। অবশেষে ১৯৬৯ সালের ১৬ জানুয়ারি 'ওয়ার্ল্ড রিন্যুয়াল স্প্রিচুয়াল ট্রাস্ট'-এর রেজিস্ট্রিকরণের কাজ সমাপ্ত হয়। এরপর বাবা আমাকে আমেদাবাদ পাঠালেন এবং বলে দিলেন নক্কী লেকের কাছে 'বুন্দি কটেজ' আছে, বিক্রি হবে, তুমি সেখানে গিয়ে কটেজ কেনার দরদস্তুর করো। আমি আমেদাবাদ পৌঁছে বাবাকে সমাচার দিলাম, বাবা কটেজ কেনার কাজ শতকরা ৯৫ ভাগ এগিয়ে গেছে, কেবল আধ ঘণ্টার কাজ বাকি। কিন্তু কটেজের মালিক বললেন রেজিস্ট্রি ৭-৮ দিন পরে করা হবে, বাবা তাহলে আমি কি আবু আসব নাকি বরোদা যাব? বরোদায় তো প্রদর্শনীর কাজ চলছে। বাবা আদেশ দিলেন বরোদা যেতে। কিন্তু অদ্ভুত এক ব্যাপার ঘটল, এদিকে দাদি প্রকাশমণিজি আমাকে আবু আসার আমন্ত্রণ জানালেন। ১৯৬৯ সাল ১৯ জানুয়ারি সকাল ১০টায় আবু পৌঁছাই। বাবা অব্যক্ত হওয়ার পর মধুবনের বাইরে থেকে আসা প্রথম ভাই হলাম আমি। বাবার অন্তিম সংস্কার-আদি করার জন্য আমি নিমিত্ত হলাম। বাবা সবসময় ঈশ্বরীয় সেবায় নিজে যেমন তৎপর থাকতেন তেমনি অন্যকেও উৎসাহ-উদ্দীপনায় পূর্ণ রাখতেন। সত্যযুগে নিজেদের প্রজাকে রাজা সব সময় কোন-না-কোন সৃজনশীল কাজে ব্যস্ত রাখবেন। এতে প্রজারা খুশিতে জীবন কাটাবেন। নিজের প্রজার রচনাশৈলী কর্মে ব্যস্ত রাখার দায়িত্বে থাকা সত্যযুগের রাজাদের সংস্কার এখনই সঙ্গমযুগে অর্জন করে নিতে হবে।

ভবিষ্যতে যিনি বিশ্ব প্রশাসকের দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন তাঁকে অবশ্যই তিনটি শংসাপত্র অর্জন করতেই হবে। যথাক্রমে তা হবে 'স্ব-প্রিয়', 'লোকপ্রিয়' ও 'প্রভুপ্রিয়'

বর্তমান কালে নতুন নতুন আইন তৈরি হয়, তৈরি হয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কিন্তু বাস্তবে এসবের প্রতিফলন পূর্ণাঙ্গরূপে হয় না। সত্যযুগে নিত্যনতুন আইন প্রণয়ন হবে না কিন্তু নব নব রূপে বিভিন্ন কার্যক্রম তৈরি হবে যার দ্বারা সকলের জীবন সদা আনন্দ ও খুশিতে পূর্ণ থাকবে। এরূপ ভবিষ্যতের রাজকার্য নিয়ন্ত্রণের যিনি অধিকারী হবেন তিনি অবশ্যই এখনই লোকপ্রিয় হবেন, সৃজনাত্মক হবেন এবং সকলের জীবনে উৎসাহ-উদ্দীপনা আনয়নকারীও হবেন।

প্রশ্ন আমাদের উত্তর দাদিজির

ভগবান 'শিব'-এর নিকট হ'তে দাদি জানকীজি 'দিব্যবুদ্ধিসম্পন্না' বরলাভ করেছেন। জীবনের মহাসংকটের সমাধান এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যুক্তি ও শক্তি দিয়ে অন্যকে মুগ্ধ করতে তিনি অদ্বিতীয়া। এখানে ভাইবোনেদের কিছু প্রশ্ন এবং দাদিজির উত্তর পরিবেশিত হ'ল।

প্রশ্ন ঃ পুরনো স্বভাব-সংস্কার থেকে কী লোকসান হয়?

উত্তর ঃ আমি নিবেদন করব নিজের যদি স্বভাব-সংস্কার সামান্যও পুরনো থাকে তাকে প্রয়োগ করো না। তুমি যদি প্রয়োগ করো তাহলে অন্যেরা ভালো ভাবনা প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে না। যে ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী তার নিজের বদলের খেয়াল আসবে আর যে ত্রিনেত্রী-ত্রিকালদর্শী নয় তার ভাবনা আসবে না, আমাকে বদলাতে হবে। অন্যেরা বদলাক এরূপ ভাবনায় দুঃখের লেনদেনের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ভালো ভাবনা রাখো, ভালো ভাইব্রেশন রাখো, এসবের দ্বারা ভাণ্ডার পূর্ণ থাকুক। কারুর নাম, রূপ, দেশ কিছুই যেন দেখতে না পাও, স্মরণে না আসে। এরূপ ন্যাচারাল স্থিতি তৈরি করো দেখবে তোমার সেবা বাবাকে এমনিতেই প্রত্যক্ষ করবে।

প্রশ্ন ঃ টেন্‌শন্ থেকে বাঁচার জন্য কী করা উচিত?

উত্তর ঃ বাবা বলেন, বৎস, শরীর ছাড়া পর্যন্ত অধ্যয়ন করতে থাকো। এরকম যেন ভাবনা না আসে, আমার জ্ঞানমার্গে এত বছর হয়ে গেল, মুরলী তো ঢের পড়ে নিয়েছি, রিভাইস কোর্সই তো চলছে। এরূপ ভাবনায় মুরলী মিস্ করলে ওই দিন ভালো কাটবে না। ওয়ান্ডার এটাই, রিভাইস কোর্স তো বটেই অথচ আজকের দিনে ওই মুরলীই একান্ত আবশ্যক। বাবা যে সময়-সারণী বেঁধে দিয়েছেন তার উপরই চলতে থাকো। যা কানে শুনেছ তা স্বরূপে নিয়ে আসো। বাবা তো বলেন, আমার নাকের লাজ রাখো। আমি কোন্ কুলের, কার সন্তান, আমার কর্তব্য কী, আমার অবস্থান কোথায়? - এসব স্মরণে রাখো। নিজেকে যেমন সাফ করবে তেমনি সেফও রাখবে। যতটা তুমি নিজের উপর অ্যাটেনশন্ রাখবে ততটাই টেন্‌শন্ ফ্রি থাকবে। টেন্‌শন্ শিরপীড়ার কারণ, মাথা ভারী করে দেয়। উৎসাহ-উদ্দীপনা কম করে দেয়। অ্যাটেনশন্ রাখলে ভারী হওয়ার প্রশ্নই আসবে না, হালকা থাকবে, উৎসাহ-উদ্দীপনার পাখায় ভর করে উড়তে থাকবে।

প্রশ্ন ঃ কোন্ এক শব্দের মধ্যে প্রচুর শক্তি ভরা আছে?

উত্তর ঃ সেবা করেও নিজের স্থিতি নির্মাণের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জ্বালামুখী যোগের মানে হল ভেতরে ভেতরে এমন লক্ষ্য থাকবে যাতে নিজের স্থিতি মজবুত হয়। কোন কারণেই যেন মুখ থেকে 'তবে' 'কিন্তু' না বেরোয়। স্থিতি মজবুত করলে অন্তরে যে ভাবনা থাকে বাবা তা পূরণ করে দেন। আর তো দুনিয়াদারির কোন ইচ্ছাই নেই। আমার ইচ্ছা হলো আমার স্থিতি মজবুত হোক, বাকি যজ্ঞ তো বাবার, অতএব আমারও। সেবা দিল্ দিয়ে ভালোবেসে করলে কারুর ভাব-স্বভাব দ্বারা প্রভাবিত হওয়া কিংবা চিন্তাও আসবে না। নিজেকে সরিয়ে নেওয়া নয় কিন্তু নির্লিপ্ত থাকতে হবে। বিষয় সমাপ্ত হয়েছে, ব্যাস্ এগিয়ে চলো। আমি দেখেছি সত্যনিষ্ঠা ও প্রেমের ভাবনা প্রকৃত কর্মযোগী বানায়। বিন্দুমাত্র সত্যনিষ্ঠায় যেন ঘাটতি না থাকে। নিজের অন্তরে ডুব দিয়ে দেখ সত্যতা আমার আছে তো? দিলে সত্যতা থাকলে সাহেব রাজি থাকবেন। আর সব বিষয় হয়তো ভুলতে পারো কিন্তু সত্যকে হৃদয় দিয়ে বুঝবে এতেই প্রচুর শক্তি ভরা আছে।

প্রশ্ন ঃ সন্তুষ্ট কে থাকতে পারে?

উত্তর ঃ বাবা নতুন বছরের জন্য সদা সন্তুষ্ট থাকার গিফ্‌ট দিয়েছেন। সদা সন্তুষ্ট সেই থাকতে পারে যে আত্মিক স্থিতিতে থাকতে সক্ষম, নিজের মর্যাদায় মজবুত

হয়রান হয় না। অতীন্দ্রিয় সুখে থাকার রাস্তা কত সূক্ষ্মভাবে দেখিয়েছেন বাবা। অতএব সদা সন্তুষ্ট থাকো। সন্তুষ্ট না-থাকার কারণ সহনশক্তির অভাব। সহনশক্তি তখনই আসে যখন ধৈর্য থাকে। বাবা বলেন, সন্তুষ্ট থাকলে সব শক্তি সহযোগ দেয়। প্রথম প্রথম ধৈর্য আর সহনশক্তি ভীষণ সহযোগ দেয়। এরপর একে একে নিজেকে গুটিয়ে ফেলার শক্তি, সকলের সাথে মানিয়ে চলার শক্তি, নির্ণয় করার শক্তি প্রভৃতি মজবুত হতে সহযোগ দেয়। বাবার কাছে এসে 'মরজীবা জন্ম' হয়েছে, অলৌকিক জন্মের খুশি তো আছেই, তার মধ্যে সন্তুষ্টতা সর্বাধিক। যে কোন মূল্যে আমাদের খুশি যেন হারিয়ে না যায়।

প্রশ্ন ঃ শিববাবার সহযোগিতা কখন পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ আমার কোন সহযোগী নেই এরকম খেয়াল যেন কখনই না আসে। হৃদয়ের ভালবাসা বাবার সাথে আছে, শক্তি আর সত্যপরায়ণতা থাকলে বিনা শর্তে সহযোগ পাওয়া যায়। আমি স্বীকার করি বাবার সহযোগ দারুণ ভাবে পাই তবুও আমি প্রার্থনা রাখি না। চাইলে তিনি সহযোগ দেন না। বাবাও জেদি কম নন, আমাদের রয়্যাল বাচ্চা বানান। যদি বল, বাবা কী করব আমাকে সহযোগ দাওনা! তো দেবেন না। কেউ লেখেন, আমি বাবার নিকট অনেকবার সহযোগ চেয়েছি কিন্তু বাবা সহযোগ দেননি। কেউ তো চিৎকার করে, মায়া ভীষণ জ্বালাতন করে, বাবা আমি কী করব.... চিৎকার করলেও বাবা সাহায্য করেন না। আমি বাবাকে ভালবেসে বলি, বাবা, আপনি দারুণ চালিয়ে নিচ্ছেন, তো বাবা বলেন, চলছ যখন চালিয়ে নিচ্ছি। যদি বলি ভালো করে চালাও না, তো বাবা বলবেন তুমি ল্যাংড়া নাকি? ভালোভাবে চলবো তো বাবা খুশিতে সহযোগ দেন। তাই তোমাদের বাবার অন্ত বলছি বাবা কেমন। বাবাকে বুঝে তাঁকে এমন সাথি করো যা বাবাও দেখে বুঝবেন আমার বাচ্চা সদা হাসিখুশিতে থাকে। মনমরা বা শুকনো নয়। যে ক্ষণে ক্ষণে মনমরা হয়ে যায় বা শুকিয়ে যায় বাবা তাকে কী বলবেন! বলবেন, আমি তোমাকে বলছি খুশিতে হাসো, আর তুমি নুয়ে পড়ছো।

"তুমি নিজের উপর অ্যাটেনশন্ রাখবে ততটাই টেন্‌শন্ ফ্রি থাকবে। টেন্‌শন্ শিরপীড়ার কারণ, মাথা ভারী করে দেয়। উৎসাহ-উদ্দীপনা কম করে দেয়। অ্যাটেনশন রাখলে ভারী হওয়ার প্রশ্নই আসবে না, হালকা থাকবে"

প্রশ্ন ঃ মুশকিল আসান করার সহজ উপায় কী?

উত্তর ঃ বিষয়কে গুটিয়ে ফেলে পবিত্রতার শক্তিকে বাড়াও। সেবা সংকল্পের শুদ্ধিতে করো তো হালকা থাকবে, খুশিতে থাকবে। কারণ বিনা সেবায় খুশি আসতে পারে না। এই পুরনো শরীরকেও ভগবান পবিত্রতার শক্তিতে চালাচ্ছেন। যদি বলি, আমি কেমন করে চলব? বাবা, আমি কী করব? এরকম বলতে বলতে আমার কেমন হাল হবে? অন্তিম জনমে বাবার শ্রীমৎ-এ চলে আমাদের 'অন্ত মতি সো গতি' ভালোই হতে চলেছে। বাবাকে নজরে রাখলে অন্য কোন বিষয় নজরে আসবে না। বাবাকে হৃদয়ে রাখলে অন্য কোন কিছু হৃদয়ে দখল নেবে না। কারণ বাবার হয়ে যাওয়ার পর দৃষ্টি, বৃত্তি এমন হয়ে যায় যে আর কোন কিছু ভালো লাগে না। সেবা করো, নেশাতে রাখো আমি কে? কার হয়েছি? দেখবে কত সুন্দর অবস্থায় থাকবে। বাবার নজরের দ্বারা সব পরিপূর্ণ হয়ে যায়। যিনি এরূপ পরিপূর্ণ করেন তাঁকে স্বামী বলা হয়। সব ভাইবোনের প্রতি আমার ভাবনা, সবাই সেবা করুক কিন্তু ভেতরে ভেতরে যিনি আপন করে হাসতে শিখিয়েছে তাঁকে কখনই ভুলো না। হাসির অভ্যাস যেন বন্ধ না হয়। কোন ব্যাপারে বেসামাল মনে হলে হাসির অভ্যাসের দ্বারা সব সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। সেবার প্রত্যেকটি পলে সেবার সাথে সহাস্য থাকো, বাবাকে এভাবে স্মরণ করলে এলাহি সুখ পাবে।

ব্রহ্মপুত্রের সূক্ষ্ম রহস্য

- ব্রহ্মাকুমার অরুণ
লেকগার্ডেন্স

ব্রহ্মাপুত্র ভগবানের মানস পুত্র। ভগবানের সংকল্প শক্তির মাধ্যমে যার সৃষ্টি। স্থূলে আর সূক্ষ্মে, ভক্তি আর জ্ঞানে, যেন মিলেমিশে একাকার। তারি রূপরেখা - ব্রহ্মপুত্র নদ, মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণে ২,৭২০ কি.মি. দীর্ঘ জনপদ অতিক্রম করে, বঙ্গোপসাগরে মিলিত হওয়ার আগে মোহনায় গঙ্গানদীর সাথে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদ কিন্তু পুংলিঙ্গ আর গঙ্গা নদী স্ত্রীলিঙ্গ। সব নদী স্ত্রীলিঙ্গ। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র উভয়ই বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। ব্রহ্মপুত্র নদ হয়েও কীভাবে স্ত্রীলিঙ্গে পরিণত হল এটার এক গুপ্ত রহস্য আছে। ভৌগোলিক তথ্য খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ আধ্যাত্মিক এক তথ্য খুঁজে পেলাম, মন খুশিতে ভরে গেল।

যেহেতু পরমেশ্বরের মানসপটে সংকল্প উঠেছিল, তিনি সৃষ্টি রচনা করবেন, তাই মানসপুত্র ব্রহ্মার সৃষ্টি হল। ব্রহ্মার বৃদ্ধ শরীর চার মাথা ও চার হাত দেখানো হয়েছে। চার মাথার অর্থ পৃথিবীর চারদিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে; হাতে শাস্ত্র অর্থাৎ গভীর জ্ঞানের অধিকারী; এক হাতে কমণ্ডলু, তাতে গঙ্গাজল যাতে আত্মা জ্ঞানগঙ্গায় নিজেকে বিধৌত করে শুদ্ধ বানাতে পারে; এক হাতে কমলফুল, এর অর্থ সংসারে থেকে পবিত্রতার আধারে জীবনকে শ্রেষ্ঠ সুন্দর করে বরদান প্রাপ্ত করা, তাই তার একহাত বরদানী মূরত থাকে। স্রষ্টা সর্বশক্তিমান তাঁর শ্রেষ্ঠ সংকল্প ব্রহ্মার মাধ্যমে ফলবতী হয়।

পৃথিবীতে যখন অনাচার-অবিচারে ছেয়ে যায়, ধর্মের গ্লানিতে ভরে যায়, তখন স্রষ্টা পরমধাম হতে পৃথিবীতে নেমে সনাতন ধর্মের বীজ বপন করেন। সেই বীজকে ধারণ করার শক্তি যার মধ্যে আছে সেই মানব আত্মার শরীরে তিনি অবতরিত হন। স্রষ্টা পরমাত্মা যিনি নিরাকার শিব, যার কোনো দেহ নেই, তাই তিনি ওই মানব শরীরকে আধার করে তার মুখ দিয়ে সৃষ্টি তথ্যের গভীর জ্ঞানকে প্রবাহিত করেন। যা গঙ্গা সম পবিত্রধারা, তাই 'গীতা'।

গীতা হচ্ছে 'মা', মা যেমন সন্তানকে লালন-পালন করে, তেমনি গীতাজ্ঞানের আধারে মানব আত্মার চৈতন্য উদয় হয়। মনকে তাই জ্ঞানগঙ্গায় ডোবাতে হয়, তবেই শুচি শুভ্র মন স্বয়ংকে ও পরমাত্মাকে চিনতে পারে ও জীবন শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর হয়। পরমাত্মা যে আধারকে যোগ্যরূপে স্বীকার করেছেন, তিনি ব্রহ্মারূপে খ্যাত হন। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তার ধারক-বাহক। তাই একদিকে তিনি পুরুষ, প্রজাপিতা ব্রহ্মা, অপরদিকে তিনিই বীজের আধার হওয়ায় পরমা প্রকৃতিরূপে, ব্রহ্মময়ী মা। মায়ের ভূমিকায় অংশ নিয়ে ব্রাহ্মণের নবজাগরণের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকায় কঠিন পুরুষার্থী। এটা অতি গুহ্য রহস্য। সেই রকম ব্রহ্মপুত্র সংকল্প শক্তির ধারক-বাহক হয়ে, একদিক দিয়ে নদ হয়েও নদীর ভূমিকায় কার্য সমাধা হয়েছে। ব্রহ্মা শব্দের মধ্যেও মায়ের রূপটি গুপ্ত অর্থাৎ বড় মা।

পৌরাণিক কাহিনিতে আছে সগরবংশের উদ্ধারের জন্য, সগরবংশীয় সন্তান ভগীরথ তপস্যার দ্বারা শিবকে তুষ্ট করে, শিবের জটা হতে গঙ্গাকে মুক্ত করে মর্তে এনেছিলেন। ভগীরথ শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে জনপদ দিয়ে এগিয়ে চলেছে, আর গঙ্গা তার পশ্চাতে বয়ে চলেছে। প্রকৃত অর্থ হচ্ছে ব্রহ্মার 'মুখকমল' শব্দতরঙ্গ জ্ঞানগঙ্গারূপী চৈতন্যধারা প্রবাহিত করে জড়বৎ বা মৃতপ্রায় মানব আত্মাকে নবজাগরণের ক্ষেত্র হিসাবে নিয়েছিলেন। ব্রহ্মা হচ্ছে ভাগ্যশালী রথ, পরমেশ্বর শিব যে রথে অবতরিত হয়ে পবিত্র জ্ঞানগঙ্গাকে প্রবাহিত করেন। একই আত্মার দুই রূপের প্রকাশ ঘটেছে যা পরমাত্মা ব্যক্ত করেন।

ব্রাহ্মণ জীবনের পরম্পরা লৌকিক বনাম অলৌকিক

- ব্রহ্মাকুমারী মৌসুমী
গরফা, কলকাতা

আমার লৌকিক জন্ম হয়েছে চ্যাটার্জী পরিবারে, আমার আত্মীয়রা মুখার্জী আর ব্যানার্জী। চক্রবর্তী বা ভট্টাচার্য্য লৌকিক ব্রাহ্মণ পদবীধারী। আমি অনেক উপনয়ন বা পৈতে দেখেছি। মজার কথা হলো আধ্যাত্মিক জ্ঞানে আসার পর জানলাম 'ব্রাহ্মণ' হয়েছি। লৌকিক দুনিয়ার ব্রাহ্মণ আর ঈশ্বরীয় দুনিয়ার ব্রাহ্মণ হওয়ার শর্ত দেখে অবাক হয়ে গেলাম। প্রকৃত ব্রাহ্মণ জন্মের মূল বিষয় - আমরা দেহ নই, 'আত্মা' - সেটা ভুলে যাওয়ায় নিজেদের শুধুই দেহ ভাববার কারণে লৌকিক শর্তগুলো শুধুই বাহ্যিক দৈহিক প্রতীকী স্বরূপ হয়ে উঠেছে। আসুন, সেগুলি কেমন রূপ নিয়েছে একবার দেখি ঃ

লৌকিক দুনিয়ার পরম্পরা

১) প্রথাটির নাম উপনয়ন বা পৈতে।

২) আনুষ্ঠানিক নিয়মে কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করা হয় যা বেশির ভাগ সময়েই অর্থ না বুঝে।

৩) মস্তক মুণ্ডন করে গৈরিক বা সাদা বসন পরিধান করা - প্রতীকী বৈরাগ্য দেখানো।

৪) 'ভগবতী ভিক্ষাং দেহি' উচ্চারণ করে ভিক্ষার ঝুলি হাতে ভিক্ষাগ্রহণ।

৫) তিনরাত্রি অসূর্যম্পশ্য থাকা।

৬) স্বপাকে নিরামিষ খাদ্যগ্রহণ।

৭) গৃহে থেকে ব্রহ্মচর্য জীবন তিনদিনের জন্য পালন।

৮) ধর্ম মা-বাবা গ্রহণ।

অলৌকিক ব্রাহ্মণ জন্ম - ঈশ্বরীয় পিতার মহাবাক্য অনুসার

১) ভগবান শিব দিচ্ছেন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র।

২) শিববাবা ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানী করান, কোন মন্ত্র উচ্চারণ বা জপের নিয়ম শেখান না।

৩) দৈহিক আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে সংসারে থেকেও সার্বিকসন্ন্যাস বা বৈরাগ্য ধারণের আদেশ দিয়েছেন। তিনি জানালেন - তুমি দেহ নও, চৈতন্য শক্তি আত্মা, শরীর পেয়েছো অভিনয়ের জন্য। সংসারে সব দায়িত্ব পালন কর কিন্তু মোহ মুক্ত হও।

৪) ফকির বা ভিক্ষুক হও কিন্তু তিনি আমাদের ভিক্ষার পাত্র নিয়ে ঘুরতে বলেননি। মায়া দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছ - কোন কিছুই তোমার নয়। আজ যেটা নিজের ভাবছো, গতকাল সেটা অন্যের ছিল, আজ তোমার, আগামীকাল অন্য কারুর হবে। তাই তোমার ব'লে বাস্তবে কিছুই নেই। সব কিছু ট্রাস্টি হয়ে দেখাশোনা কর।

৫) দেহ ও দেহ-সম্বন্ধ মুক্ত হয়ে আমার সাথে যোগযুক্ত হতে হবে, এতে পবিত্র ও পাপমুক্ত হয়ে কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছানো যাবে।

৬) যোগযুক্ত হয়ে নিরামিষ রন্ধন কর, তারপর পিতাকে নিবেদন করে একান্তে তাঁর স্মৃতিতে গ্রহণ করো।

৭) ঈশ্বরীয় মত - হিরেতুল্য সঙ্গমযুগে গৃহেই সন্ন্যাসীর মতো ব্রহ্মচর্য ধারণ করো। আত্মার লিঙ্গ হয় না। সবাইকে ভাই-ভাই দৃষ্টিতে দেখো। জগৎ-সংসারের কাজকর্ম দৈহিক আকর্ষণের জন্য হয় - তাই দৃষ্টিবদল অত্যন্ত জরুরি।

৮) স্বয়ং ঈশ্বর ব্রহ্মাবাবার মাধ্যমে সকল ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ আত্মাকে অ্যাডপ্ট করেন, এক দেহে তিনিই হন মাতাপিতা।

স্মৃতি দুর্বল হয়ে যাবার জন্য - আত্মা রথী, দেহ রথ - এই সত্যের ভুলে দুনিয়াই পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই ব্রাহ্মণ ব্যাপারটা প্রতীকী হয়ে শুধু নিয়মের জালে জড়িয়ে রয়েছে, কোন আত্মিক উন্নতি ঘটেনি। আধ্যাত্মিক জ্ঞানে এসে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয়ে জীবন ধন্য হল।

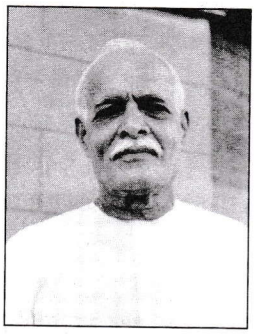

আদিদেব

- ব্রহ্মাকুমার জগদীশচন্দ্র

আমার বাবা শুনলেন এবং সহমত পোষণ না করে পারলেন না। তিনি মাংসভোজন ও সুরাপানের জন্য আফসোস করতে লাগলেন। ওম্ রাধে তাকে প্রত্যয় দিলেন যে, ক্রোধ হচ্ছে পাপ। তিনি এক চৈতন্য আত্মা; এক শাশ্বত সত্তা এই ক্ষণস্থায়ী শরীরের মাঝে বাস করছে - এই সব ধারণা, তার মনের মাঝে দাগ কাটল। তিনি বাড়ি ফিরলেন। এক পরিবর্তিত মানুষ।

বাড়ি পৌঁছে তিনি সমস্ত মদের বোতল রাস্তায় নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ফ্রান্সের তৈরি এই সব মদ খুবই দামি। তাঁর ভাই ছুটে এসে বললেন, "দাদা, তুমি এগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছ কেন? তুমি যদি না পান করতে চাও তো আমাকে দিয়ে দাও।" আমার পিতা বললেন, "যে পাপ আমি ছেড়ে দিয়েছি, সেই পাপ আমি তোমাকে কী করে দিতে পারি? আমি এটা করতে পারব না।" সেদিন থেকে আমার বাবা সম্পূর্ণ নিরামিষাশী হলেন এবং তারপরে কখনো এক ফোঁটা সুরাও স্পর্শ করেননি। তারপর তিনি অনুমতি পত্রে শুধু সই-ই করলেন না, পরিবারের সকলেই যাতে সৎসঙ্গে গিয়ে জ্ঞান আহরণ করতে পারে তারও আলাদা অনুমতি পত্রে সই করলেন। নিজের জন্যও পরে একটি অনুরূপ চিঠি লিখলেন। তিনি হেসে উঠে বললেন, "আমি সুরাপান ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু আমি জ্ঞান-অমৃত পান শুরু করেছি। আমি এখন এই নেশাতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠব। তিনি খুব আনন্দ বোধ করতে, আমাদের সমস্ত পরিবারের উপর থেকে এক বিরাট বোঝা যেন সরে গেল। এ হল শিববাবার জাদু।

ওম্ উচ্চ বিদ্যালয়

পরিবারের সকলেই সৎসঙ্গে যেতে শুরু করলেন এবং তারা ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, প্রচলিত ধারার লৌকিক শিক্ষা - যেমন, পড়া, লেখা, অঙ্ক ইত্যাদি ও তার সঙ্গে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, বাচ্চা ছেলেমেয়েদের জন্য ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হয়। বুনিয়াদি শিক্ষা - যেমন, কাঠের কাজ, সেলাইয়ের কাজ - এসবেরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ব্রহ্মাবাবারও এরূপ পরিকল্পনা ছিল গোড়া থেকেই । কেননা, শিশুরা যদি পবিত্রতা ও সদ্‌গুণ ইত্যাদি আদর্শের উপর লালিতপালিত হয়, তাহলে পৃথিবীর প্রভূত মঙ্গল সাধিত হবে। সুতরাং পরিকল্পনা তৈরি করা হল এবং শীঘ্রই তার বাস্তব রূপ দেওয়া হল। ব্রহ্মাবাবার এক নতুন বাড়িতে বিশেষ সুবিধা থাকার জন্য, বাচ্চাদের এক বোর্ডিং স্কুল খোলা হয়। নাম দেওয়া হয় 'ওম্ উচ্চবিদ্যালয়'। বিভিন্ন বয়সের শিশুরা আসতে লাগল এবং বয়োজ্যেষ্ঠরা ছোটদের শিক্ষা দেওয়ার কাজে সহায়তা করতে লাগল। মাতাদের দেখাশোনার ভার দেওয়া হল। বিছানা, আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র ও ইউনিফর্মের ব্যবস্থা হল। একটি চিকিৎসালয়েরও ব্যবস্থা হল। রান্না ও খাবারঘর তৈরি হল। অতিরিক্ত স্নানঘর তৈরি হল। বাচ্চারা, রাজপুত্র-রাজকন্যার মতো সব সুবিধাসহ লালিত পালিত হতে লাগল। কোমলতা ও শৃঙ্খলাপরায়ণতাও শিক্ষার অঙ্গ ছিল। অত্যন্ত স্নেহের পরিমণ্ডলে স্কুলের কার্যক্রম চলতে লাগল।

ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্লাস ও বিভক্ত করা হল। ৬ থেকে ১০ বছর

বয়সের ছেলেদের একটি ক্লাস ও ১১ থেকে ১৪ বছরের মেয়েদের অন্য ক্লাস করা হল। প্রত্যেক দিনের রুটিন এই রকম ছিল ঃ

সকাল ৫-০০টা ঃ শিশুরা ঘুম থেকে উঠবে। হালকা ব্যায়াম ও হাঁটা। তারপর শান্তি অনুভবের মেডিটেশন।

সকাল ৬-৩০টা ঃ স্নান ও প্রাতরাশ (সকালের হালকা ভোজন)

সকাল ৮-৩০টা ঃ পড়াশোনা শুরু

সকাল ১০-৩০টা ঃ বিশ্রাম, ফলাহার

সকাল ১১-০১টা ঃ পড়াশোনার ক্লাস

দুপুর ১টা ঃ মধ্যাহ্ন ভোজন ও বিশ্রাম

বিকাল ৩টা ঃ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উপর ক্লাস, তারপর সঙ্গীত ও আলোচনা

বিকাল ৫টা ঃ দুগ্ধপান এবং সান্ধ্যকালীন হাঁটা

রাত্রি ৭-৩০টা ঃ নৈশভোজ

রাত্রি ৮-৩০টা ঃ নিজের ভিতর ভালো গুণ কীভাবে ধারণ করা যায়, খাদ্যের পবিত্রতার গুরুত্ব, কীভাবে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার মোকাবিলা করা যায় এবং শিশুদের জ্ঞানবিষয়ক নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া - এসবের চর্চা হয়।

রাত্রি ১০টা ঃ সমাধি

রাত্রি ১০-৩০টা ঃ নিদ্রা।

"আমি সুরাপান ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু আমি জ্ঞান-অমৃত পান শুরু করেছি। আমি এখন এই নেশাতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠব।"

আধ্যাত্মিক সচেতনতার শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া হত। শিশুরা বেশ পরিশ্রমী শরীর চর্চার দ্বারা নিজেদের শরীর বলশালী ও মজবুত বানাতে লাগল। প্রচুর সূর্যালোক ও নানারূপ খেলাধূলা, তাদের চনমনে এবং উচ্চ চেতনার স্থিতিতে রাখত। ইউনিফর্ম পরে তারা ক্লিফ্টন্ বেলাভূমিতে প্রাতঃকালীন ড্রিল উপভোগ করত; ব্রহ্মাবাবা প্রায়শঃই তাদের সেখানে নিয়ে যেতেন। ইউনিফর্ম পরিহিতা মেয়েরা মানসিক হীনতাবোধ থেকে বেরিয়ে এল এবং এর সঙ্গে দুর্বলতা ও বশ্যতার সামাজিক বাঁধাও অতিক্রান্ত হল। আরও গুরুত্বপূর্ণ যে নানারূপ ড্রিল করার সময়ও তারা ঈশ্বরকে স্মরণ করত।

মাঝে মাঝে ব্রহ্মাবাবা তাদের সমুদ্রসৈকতে নিয়ে গিয়ে বিশেষ যোগ তপস্যায় বসাতেন। পরস্পরের মধ্যে বেশকিছুটা তফাৎ রেখে তারা বালির বড় ঢিবি বা পাথর খণ্ডের উপর বসে ধ্যান করত। প্রাতঃকালের মেঘমুক্ত স্নিগ্ধ সূর্যালোকে তারা একান্তে পরমপিতার সান্নিধ্যে, নিজের শাশ্বত রূপকে উপলব্ধি করত এবং পরমপিতার সঙ্গে দীর্ঘ প্রেমময় মিলনে আপ্লুত থাকত।

শিশুরা স্কুলে ফিরে কর্মযোগে নিয়োজিত হত - ক্লাসরুম পরিষ্কার করা, নিজেদের বিছানা পরিপাটি করা, স্নানাগার পরিচ্ছন্ন রাখা, নিজেদের জামাকাপড় ধোয়া ইত্যাদি সবকিছুই তারা নিখুঁত রাখত। দর্শনার্থীরা, শিশুদের এইরূপ নির্মল স্বভাব তৈরির নিরন্তর প্রচেষ্টা দেখে খুবই আনন্দিত হতেন।

(ক্রমশঃ)

শিব ভগবানুবাচ - আমার সেই সন্তানই সৎ যে ইউনিভার্সকে পবিত্র করার সেবা করে। তোমরা সন্তানেরা নিজেদের সতোপ্রধান বৃত্তি দ্বারা প্রকৃতির পাঁচ তত্ত্বও সর্ব আত্মাকে সতোপ্রধান করার জন্য শক্তিশালী ভাইব্রেশান প্রদান করো।

ষোলকলা সম্পন্ন হ'তে...

অব্যক্ত অনুভব ঃ

১। আমি সতোপ্রধান আত্মা....সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কণার মাধ্যমে একে অপরের সাথে জুড়ে আছে....আমি যদি এই দেহরূপী প্রকৃতির সম্পর্কে থাকি তো ব্রহ্মাণ্ডের অন্তিম কণার সাথেও আমি সম্পর্কিত....সম্পূর্ণ প্রকৃতির সাথে আমি জুড়ে আছি....আমি পাঁচতত্ত্বের সামনে যখন আমার শরীরকে দেখি তখন একাকার দেখি.... যখন পৃথ্বী বলি তখন আমার শরীরের সারা কোষগুলি পৃথ্বীর কোষে পরিবর্তিত হয়ে সম্পূর্ণ প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে যায়....এখন আমি সতোপ্রধান আত্মা, পবিত্রতার সাগর মহাজ্যোতির সাথে বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হয়ে পবিত্রতার অসীম কিরণ স্বয়ং ধারণ করছি এবং আমার থেকে কিরণ বিচ্ছুরিত হয়ে সারা ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ছে, পৃথ্বী তত্ত্বে পৌঁছে দিয়ে তাদের পবিত্র করছি....এভাবে আকাশ তত্ত্বে, নিজের দেহের সাথে সাথে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডতে কিরণ প্রবাহিত করছি....বিশাল মহাশূন্যে নিজেকে স্রেফ আত্মা রূপে স্থিত রেখে বায়ুতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্বকে পবিত্র ও সতোপ্রধান করছি।

২। আমি সতোপ্রধান আত্মা আমার সম্মুখে সম্পূর্ণ গ্লোবরূপ বিশ্বকে প্রকট করছি....সমস্ত আত্মা তারকার ন্যায় প্রকটিত....সব আত্মা রূপী আত্মা তারকাকে পবিত্র ভাইব্রেশন প্রদান করছি.... তাঁদের সতোপ্রধানে পরিণত হওয়ার প্রেরণা দিয়ে চলেছি....সবাইকে মায়াজিৎ হওয়ার বরদান দিচ্ছি....পাঁচ বিকার থেকে মুক্ত করছি।

স্বচিন্তন ঃ ১। ইউনিভার্সকে সেবা করতে গিয়ে অন্য কোনরূপ চিন্তা যেন না আসে। যদি আসে তাহলে তাকে যোগাভ্যাস দ্বারাই দূর করতে হবে।

২। সতোপ্রধান অবস্থার বিশেষতা কীরূপ হয়ে থাকে তা ভাবতে হবে। সতোপ্রধানতা যদি এখনো অর্জিত না হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ কী?

তীব্র পুরুষার্থের জন্য প্রেরণা ঃ

হে সতোপ্রধান আত্মা! তুমি কি অনুভব করেছো অতীন্দ্রিয় সুখ ও পরমানন্দ সতোপ্রধান অবস্থায় কতখানি আছে ? জেনে রাখো, সঙ্গম যুগে এই দুর্লভ সুখ অনুভবের জন্য খুব অল্প সময়ই পাওয়া যায়। সত্যযুগে তো স্বতঃই আমরা সতোপ্রধান স্থিতিতে থাকবো কিন্তু এই অবস্থার সুখ বা এর মহত্ত্বের জ্ঞান এই সময়ে লাভ হয়। অতএব আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে, যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা আসুক না কেন আমরা যেন এই অবস্থা থেকে টলে না যাই। যে কোন রূপ পরীক্ষা আমাকে যেন এ-বিন্দুও নড়াতে না পারে। ব্যাস্, আমাকে ধীরস্থির হতে হবে। আমাকে অটল থাকতে হবে।

কালচক্রের নির্দিষ্ট সময়ে ভগবান শ্রেষ্ঠ জীবনশৈলী স্থাপন করেন

-ব্রহ্মাকুমারী ঊষা
আবু পর্বত

আজ এই সংসার অনেক রকম সমস্যার বোঝা বয়ে নিয়ে চলেছে, কত রকমের রূপ ধারণ করে সমস্যা যে মানুষকে সংকটে ফেলে দেয় তার ইয়ত্তা নেই। এ-কারণেই মানুষ ঘন ঘন পরিস্থিতির শিকার হয়ে যায়। কত ধরনের লড়াই যুদ্ধ এই সংসারে হয়ে চলেছে। অধর্ম যখন তার চরম সীমায় পৌঁছায়, সব অনাচার অত্যাচার পাপাচার অতিকে ছুঁয়ে ফেলে তখনই ভগবানকে তাঁর নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই অতিকে পরিবর্তন করার জন্য এই ধরাধামে অবতীর্ণ হতে হয়। গীতাজ্ঞান অনুযায়ী নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনে ভগবান এই দুনিয়ায় অবতরণ করেন। দুর্গতি থেকে মুক্তি পেয়ে শ্রেষ্ঠগতি প্রাপ্ত করার জন্য, জীবনকে শ্রেষ্ঠ করার জন্য মানুষকে তিনি বিধি বাতলে দেন। আদর্শ জীবন নিয়ে কীভাবে বেঁচে থাকতে হয় সেই কলা পুনরায় তাঁকে শেখাতে হয়। বলা হয় মহাভারত যে হয়েছে তা কুরু পরিবারকে কেন্দ্র করে হয়েছে। 'কুরু' শব্দের অর্থ হল করো। পাণ্ডব ও কৌরব 'কুরু' পরিবারের সবাই সদস্য ছিল। প্রশ্ন উঠবে পাণ্ডব কাকে বলা হবে আর কৌরব কাকে বলা হবে। শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে কৌরব পাণ্ডবদের মধ্যে যখন বেশ গভীর মতভেদের উদ্ভব হয়েছে তখন তাদের একত্র থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তখন উভয়ই ভগবানের কাছে সহযোগিতা লাভের আশায় হাজির হয়েছে। পাণ্ডবদের পক্ষে অর্জুন এবং কৌরবদের হয়ে দুর্যোধন উপস্থিত হয়েছেন। দু'জনার উপস্থিতির ধরন পৃথক ছিল। অর্জুন হাতজোড় করে বিনম্রতার সাথে ভগবানের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর দুর্যোধন যাকে অহংকারের প্রতীক বলা হয় তিনি ভগবানের মাথার পাশে বসেছিলেন। দু'জনেই ভগবানের কৃপা চান।

দুর্যোধন নিজের অধিকার অর্থাৎ তার প্রার্থনা করার সুযোগ প্রথমেই হওয়া উচিত, এটা বোঝাতে গিয়ে তিনি দাবি করলেন, এখানে তিনি প্রথমেই এসেছেন। ভগবান রহস্যপূর্ণ স্মিতহাসি হেসে বললেন, আচ্ছা তুমিই আগে বল কী চাও? ভগবান তাঁকে চাওয়ার সূত্র ধরিয়ে দিয়ে বললেন, দেখ, একদিকে আমি আর অন্যদিকে অক্ষৌহিণী সেনা, তুমি বল, তুমি কী চাও? যে পক্ষে আমি থাকব, আমি যুদ্ধ করব না। ওই সময় দুর্যোধন ভগবানের শক্তির অনুভব করতে পারেননি। এজন্য তিনি ভাবলেন, ভগবান যখন যুদ্ধই করবেন না, তাহলে তাঁকে নিয়ে লাভ কী হবে? এই ভাবনার বশে তিনি বলে ফেললেন, আমার অক্ষৌহিণী সেনা চাই। এর ভাবার্থ হল, প্রচলিত কথা আছে না, 'বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি বিনশয়ন্তি'। যখন তার বিনাশের সময় এসেছে তখন তার প্রীত ভগবানের সাথে ছিল না অর্থাৎ বিপরীত বুদ্ধি ছিল। অর্জুন, যার ঈশ্বরের সাথে প্রীত ছিল, ঈশ্বরের শক্তি সম্বন্ধে তিনি ভালোরকম অবগত ছিলেন তিনি জানতেন, ভগবান যদি যুদ্ধ না-ও করেন তবুও বিজয়ী করার ক্ষমতা আছে। এজন্যই তিনি বিনম্রচিত্তে বলে ফেললেন, ভগবান, আপনি আমার জন্য সবকিছু। ইহার ভাবার্থ হল, ভগবানের শক্তির পরিচয় পেতে জীবনে বিনম্রতা চাই। অহংকারে পূর্ণ ব্যক্তি কখনই ভগবানকে ভালোবাসতে পারেনা। এমনকী ভগবানের শক্তিরও পরিচয় পেতে পারে না। আজ বিশ্বময় মহাভারতের অবস্থা এই সময়ে যত বিনম্রতা ধারণ করব এবং ভগবানকে ভালোবাসব ততই ভগবানের সঙ্গ অনুভব করব। ভগবান এই সময়ে জীবনের প্রতি মুহূর্তের বিঘ্নের বিজয়ী হওয়ার বিধি প্রেরণারূপে দিতে থাকেন। যদি ভাবনায় রাখি আমি সব করতে

(শেষাংশ ২২ পাতায়)

নারী-উত্থানে ব্রহ্মাবাবার ভূমিকা

- ব্রহ্মাকুমার শিবু
কলকাতা

এই সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চে এমন একটা সময় ছিল যখন নারী মা, ভগ্নী, স্ত্রী, সহধর্মিণী, সখী, আত্মজা, দুহিতা, কন্যা, কুমারী, তনুদ্ভবা, সর্বোপরি দেবী রূপে সম্মানীয়া, শ্রদ্ধেয়া ও পূজ্যা ছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে পরিবার সুস্থ, সুন্দর ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে সমাজ এমনকী রাষ্ট্রব্যবস্থাও। এর মূলে ছিল তাঁর প্রচুর সম্পদ। পবিত্রতা ও গুণরূপী সম্পদ ছিল, লজ্জারূপী ভূষণ ছিল। আর ছিল হিরে-জহরত মণিমাণিক্যের অঢেল অলংকার, অনুষঙ্গে ছিল জীবন্মুক্তির বাতাস। সত্যযুগের দিকে একটু দৃষ্টি ফেরালে দেখব সেখানে নারীর স্থান পুরুষের আগে ছিল। আমরা সাধারণ ভাবে বলে উঠি রাধা-কৃষ্ণ কিংবা লক্ষ্মী-নারায়ণ। কখনও বলিনা কৃষ্ণ-রাধা বা নারায়ণ-লক্ষ্মী। এতেই প্রমাণ হয় ওই সময়ের নারী কতখানি সম্পন্ন ও সম্মানের অধিকারী ছিল। ওই সময়ে রাজসিংহাসনে নারী মহারানির আসন অলংকৃত করতেন।

স্বাভাবিক নিয়মেই কালের চাকা ঘুরে চলে কিন্তু 'পরিবর্তন' শব্দটির কোন পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তনের হাত ধরে সমাজ-সংসার ও নারীর অবস্থানের রূপ বদল হতে থাকে। পরিবর্তনের অনিবার্য নিয়মকে বাধ্য হয়ে স্বীকার করে নিতে হয়। কালের জাঁতাকলে পড়ে নারীর সম্পদের ভাটার টান পড়ে, তার সাথে পুরুষসমাজও তার প্রকৃত পৌরুষের গরিমা হারাতে থাকে। নারী-পুরুষ উভয়েরই মন-বুদ্ধির গুণগত মান ক্রমহ্রাসমান হতে থাকল। শুরু হল পেশীবলে বলীয়ান পুরুষের অপেক্ষাকৃত শারীরিক বলে দুর্বল নারীর উপর আস্ফালন। নারী-পুরুষের সুছন্দের তান পুরুষ ভুলে গেল। মানব শরীরে দুটো পা ঠিক না রাখলে হাঁটার স্বাভাবিকতা হারিয়ে ল্যাংড়াতে হয়। বর্তমান সমাজচিত্রে নারী-পুরুষের সম্পর্ক টেনে হিঁচড়ে বয়ে চলা ল্যাংড়ানো ছাড়া আর কী-বা বলা চলে। সমকালীন সমাজে বহুলাংশে নারী এখন পূজ্যা নয়, পুরুষের চোখে সে ভোগ্যা।

অস্বীকার করার উপায় নেই সময়ের তালে নারীও তার অন্তরের অলংকার খুইয়ে বসেছে। এককালে নারী রূপমাধুর্য, লাবণ্যবৃদ্ধিতে এবং আভিজাত্য প্রকাশে শরীরে অলংকার পরত, আজও পরে কিন্তু এখন যেন তার অন্য মানে দাঁড়ায়। কানের গহনা, নাকে নথ, গলায় ললন্তিকা, হাতে কঙ্কন, কোমরে কটিবন্ধ, পায়ে নূপুর এসব এখন ভূষণ নয় বন্ধন, বেড়ি মনে হয়। পুরুষের হাতে সে বন্দি ও অবলা। সমাজে উঁচু থেকে নিচু স্তরে থাকা কোন পুরুষ তাকে রেহাই দেয়নি। সম্রাট, নবাবরা খেয়াল-খুশিমতো তাকে ভোগ্যা করেছে। হারেমে স্থান দিয়েছে। সাধারণ পুরুষও 'বিবাহ' নামক বন্ধনে আবদ্ধ করে নারীর ইচ্ছা, অনিচ্ছা, স্বাস্থ্য এসব ধর্তব্যের মধ্যে রাখেনি, গুরুত্ব দেয়নি। স্ত্রীরূপে স্বামীর কাছে, কন্যারূপে পিতার কাছে, মা রূপে সন্তানের কাছে সে বন্দিদশা ভোগ করে আসছে। কখনো সে মুক্তি পেতে চেয়েছে, কখনো-বা এ বন্দিদশাকে ভবিতব্য ভেবে সবকিছু মেনে নিয়েছে। অত্যাচারিতা আর বঞ্চিতা হওয়া বুঝি একমাত্র তারই সাজে। কন্যাভ্রূণ হলে তাকেই হত হতে হবে, পণপ্রথার শিকার তাকেই হতে হবে, কন্যা সন্তান প্রসবের দায় তারই, শিক্ষাদীক্ষা ও ধর্মাচারণ থেকে সে-ই বঞ্চিত হবে, সম্পত্তির অধিকার থেকে সে-ই দূরে থাকবে। পরিবারে কন্যাকে স্নেহ-আদর না-দিলেও চলবে তার কারণ কন্যারত্ন পরের ধন। আধ্যাত্মিকতার অধিকার তার নিষ্প্রয়োজন। সর্বোপরি, নারীর নিজের শরীরের অধিকারও তার নয়। এরকম কত বলব! কারণ এ-লেখার সীমাবদ্ধতার দায়ও তো আছে।

বর্তমান বিশ্বে নারী নির্যাতন ও নারীর সম্ভ্রম হরণের যে লীলাখেলা চলছে তাতে ভারত

এই খেলায় বিশেষ উজ্জ্বল স্থান অধিকার করে। ভারতের কোন কোন প্রদেশে আজও কোন পরিবারে বকনা বাছুর জন্মালে যতখানি আনন্দ-উল্লাস করা হয়, ঠিক ততখানি নিরানন্দ, হা-হুতাশ ও শোকের ছায়া নেমে আসে যদি ওই পরিবারে একটি কন্যা সন্তান জন্মায়। অনাদর, অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য এমন এক পর্যায়ে গেছে যে নবজাত কন্যা সন্তানকে কখনো কখনো পিতা কিংবা মাতার হাতে প্রাণবিসর্জন দিয়ে তার জন্মানোর মূল্য চোকাতে হয়। এ-ঘটনা এখন আকছার হচ্ছে। এর জন্য মূলত দায়ী অজ্ঞনতা, অযৌক্তিক চাহিদা, অপবিত্রতা, দরিদ্রতা, অমানবিকতা - সর্বোপরি কুশিক্ষার প্রভাব।

পাহাড়প্রমাণ সমস্যা নিয়ে নারীসমাজও চলমান ধারার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে বহুক্ষেত্রে সে শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে কোনক্ষেত্রে কোন অংশে পুরুষের চেয়ে সে কম নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে মানবিক দৃষ্টিতে সে অনেক এগিয়ে। সহনশীলতা, ধৈর্য, ত্যাগ, সেবা, স্নেহ ও মাতৃত্বে কোন্ পুরুষ তার সমকক্ষ? নারী-হৃদয়কে তাই পারাবারের সাথে তুলনা করা হয়। নারী জেগে ওঠা মানেই সমাজ-সংসারে সুখশান্তি দৃঢ় হওয়া।

সহনশীলতা, ধৈর্য, ত্যাগ, সেবা, স্নেহ ও মাতৃত্বে কোন্ পুরুষ তার সমকক্ষ? নারী-হৃদয়কে তাই পারাবারের সাথে তুলনা করা হয়। নারী জেগে ওঠা মানেই সমাজ-সংসারে সুখশান্তি দৃঢ় হওয়া।

ইদানিংকালে নারী সমাজের একটি অংশ স্বাধীনতা, শিক্ষা ও প্রগতির নামে নিজেকে শুধুমাত্র 'নারী' হিসাবে যেভাবে মেলে ধরছে তাতে কিন্তু নিজেকে ভোগ্যপণ্য করে ছাড়ছে। 'লজ্জা নারীর ভূষণ' এ শুদ্ধ গরিমায় তার বিশ্বাস নেই। চলচ্চিত্রে, মডেলিং-এ, বিজ্ঞাপনে শিল্পের নামে যে শারীরিক উন্মুক্ত বিভঙ্গ প্রকট করা হচ্ছে তার দ্বারা সুস্থ ও পবিত্র মানসিকতা হনন হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। অর্থ, নাম-যশ ও নিজেকে আকর্ষণীয়া করাই হল এর মূল লক্ষ্য। বর্তমান সমাজের এক সিংহভাগ অংশ নিজেকে আধুনিক মনস্ক মনে করে নারীদের এই ভূমিকাকে সমর্থন করে। নারী-অধিকারের সুযোগ নিয়ে বহু নারী বেপরোয়া হয়ে 'সম্পর্ক দূষণ' ছড়াচ্ছে, যা অভিপ্রেত নয়।

শান্ত জলাশয়ে ঢিল পড়লে জলের তরঙ্গ তো উঠবেই। এই তরঙ্গ শান্ত হতে সময়ও লাগবে। বিগত ২৫০০ বছর যাবৎ শুধু নারীসমাজই ক্ষতবিক্ষত হয়নি, পুরো বিশ্ব সমাজের ছন্দটাই যেন কোথায় তালগোল পাকিয়ে গেছে। অস্থির বিশ্বসমাজকে সুশৃঙ্খল করার ক্ষমতা কোন দেহধারী অবতার বা ধর্মপিতা বা মহামানবের নেই। স্বয়ং ভগবানকে দায়িত্ব নিতে হয়। স্বয়ং ভগবান বর্তমান বিশ্বের যুগপুরুষ প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা আদর্শ বিশ্বসমাজ গঠনের মহান কার্য শুরু করে দিয়েছেন। তিনি অবলা, বঞ্চিতা, ভোগ্যা, বন্দিদশা ও অতি আধুনিকা হওয়া থেকে নারীকে মুক্তি দিতে উন্মুখ। এই মহান কর্মে নারীসমাজকে অগ্রণী ভূমিকায় রেখে সবাইকে এই মহতী কর্মে আহ্বান জানিয়েছেন। পরমপিতা পরমাত্মা বিশ্বকল্যাণকারী নিরাকার ভগবান 'শিব' নিজেকে গুপ্ত রেখে প্রজাপিতা ব্রহ্মা ও নারীশক্তিকে প্রকট করে আদর্শ যুগ স্বর্ণযুগ বা সত্যযুগ স্থাপন করছেন।

ব্রহ্মাবাবার পরিচয় সাধারণ মানুষের কাছে সুস্পষ্ট নয়। ব্রহ্মা হলেন আদিদেব, বড়মা, প্রথম ব্রাহ্মণ, আদম, নতুন সৃষ্টির প্রথম কলম, অগ্রজ, পূর্বজ, প্রপিতামহ, ভগবানের পরেই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চের সর্বোচ্চ রঙ্গকর্মী ও ভগবানের রথ বা ভগীরথ প্রভৃতি নামে খ্যাত। ব্রহ্মাবাবা লৌকিকে 'দাদা লেখরাজ' নামে সুবিখ্যাত রত্নের ব্যবসায়ী রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ব্যক্তি হিসাবে বিশাল উদার, দানী, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল, ধার্মিক, সমাজ-সচেতক, আধুনিক ও নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শ্রীনারায়ণের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। একটি চিত্রে ছিল শ্রীলক্ষ্মী শয়নরত শ্রীনারায়ণের পদসেবা করছেন। দাদা

লেখরাজ চিত্রকর ডাকিয়ে ওই চিত্র থেকে শ্রীলক্ষ্মীকে সরিয়ে দেন। দাদার মনে হয়েছে শ্রীলক্ষ্মী দাসীবৃত্তির এই রূপ মোটেই শোভনীয় নয়। ব্রহ্মাবাবা ভগবান শিবের রথ হবার পর মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন নারীশক্তির উত্থানের দ্বারাই বিশ্বের উত্থান হবে। তাই তিনি ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি কন্যা ও মাতাদের নিয়ে গঠিত ট্রাস্টে উৎসর্গ করে নারীসমাজকে কুর্ণিশ জানিয়ে নিজের আধ্যাত্মিক জীবন প্রকৃত 'রাজঋষি'র ন্যায় শুরু করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে ব্রহ্মাবাবার এরকম পদক্ষেপের দ্বিতীয় উদাহরণ নেই। বিশ্ব পরিবর্তনে মায়েদের যে স্নেহ, প্রেম,সহনশীলতা, ত্যাগ, সেবা, সর্বোপরি শক্তির যে ভাণ্ডার কাজে লাগবে তা উপলব্ধি করে তিনি নির্দ্বিধায় বলেছিলেন, 'আমি এঁদের সেবক', এঁদেরই 'বন্দেমাতরম্' বলা চাই। মায়েদের, কন্যাদের আশ্রয় দেবার জন্য ব্রহ্মাবাবাকে অজস্র সমালোচনা, অত্যাচার, কটূক্তি হজম করতে হয়েছিল। স্বতন্ত্রভাবে আধ্যাত্মিকতায় অংশগ্রহণের আইনত অধিকার শুধু পুরুষদের ছিল ব্রহ্মাবাবার প্রয়াসে নারীরাও সেই অধিকার পেয়েছে। নারীদের 'নারায়ণশিলা' স্পর্শ তো দূরের কথা ওম্ ধ্বনি দেওয়ারও অধিকার ছিল না। ব্রহ্মাবাবা ওম্ ধ্বনি দেওয়ার অধিকার দিলেন। ভগবান শিবের নির্দেশে ভগবান প্রদত্ত জ্ঞানের কলস ব্রহ্মাবাবা নারীদের মস্তকে ন্যস্ত করলেন এবং তাঁদের আত্মশক্তি জাগ্রত করার জন্য বোঝালেন - তুমি আত্মা 'পুরুষ', তোমার শরীর 'প্রকৃতি' অর্থাৎ নারী। তুমি নিজেকে শরীর ভাবলে 'বকরি' হবে আর আত্মা ভাবলে 'বাঘ' হবে। আরো বোঝালেন তুমি সুশীলা ও পবিত্র হলে 'একশত ব্রাহ্মণের সমান একজন ব্রাহ্মণী' হবে।

তুমি আত্মা 'পুরুষ', তোমার শরীর 'প্রকৃতি' অর্থাৎ নারী। তুমি নিজেকে শরীর ভাবলে 'বকরি' হবে আর আত্মা ভাবলে 'বাঘ' হবে।

আর একটি মহান পদক্ষেপ নিলেন। ব্রহ্মাকুমারীজ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার মুখ্য ভূমিকায় থাকবে নারী - একথা তিনি দৈবী পরিবারের সংবিধান রচনা করে তাতে স্পষ্ট উল্লেখ রাখেন। আজ বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মাকুমারীজের মুখ্য কেন্দ্র ও শাখা সেবাকেন্দ্রে মূল দায়িত্বে নারী। ব্রহ্মাবাবা অব্যক্ত হওয়ার পূর্বে মুখ্য সঞ্চালিকার দায়িত্ব সামলেছেন মাতেশ্বরী মাম্মা, বাবা অব্যক্ত হওয়ার পরে দাদি প্রকাশমণিজি এবং দাদি জানকীজি। এঁদের কুশলী পরিচালনায় ব্রহ্মাকুমারীজ প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্যে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। এতদিন নারীরা অত্যাচারিতা, বঞ্চিতা, অপমানিতা, লাঞ্ছিতা হয়েছে, নিরাপত্তা হীনতায় দিন কাটিয়েছে। ব্রহ্মাবাবার পেতে দেওয়া গালিচায় সেই নারীদের স্বাগত জানানোর জন্যই ব্রহ্মাকুমারীজ প্রতিষ্ঠান। নারীরা অংশগ্রহণ করে দেখুক, তাদের হৃতগৌরব ফিরে পাবেই। ব্রহ্মাবাবা অব্যক্ত হয়েও গ্যারান্টি দিচ্ছেন। বর্তমান বাস্তব চিত্র হল, নারীশক্তি জেগে উঠছে ভগবান শিব এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মার সংকল্প নারীশক্তি জাগরণের মধ্যদিয়ে আদর্শ যুগ সত্যযুগ স্থাপন, তা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

(১৯ পাতার পর)

সক্ষম, তাহলে ভগবানের বিপরীত হয়ে গেলাম। যে বিপরীত হয়ে যায় তার বিনাশ শুধু সময়ের অপেক্ষা। এরূপ পরিস্থিতিতে নিজের মানসিক স্থিতি কেমন হওয়া উচিত তা শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে। বলা হয় প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে দু-প্রকারের প্রবৃত্তি থাকে, এক দৈবী প্রবৃত্তি আর দুই আসুরী প্রবৃত্তি। দৈবী প্রবৃত্তিতে ধর্ম অর্থাৎ পবিত্রতার শর্ত, ইহা হল প্রাথমিক বিষয়, যা আজ মানুষ ভুলে গিয়ে আসুরী প্রবৃত্তি অর্থাৎ মন-বচন-কর্মে অধর্ম অর্থাৎ অপবিত্রতার সদর্প উপস্থিতিকে আপন করে নিয়েছে। ভগবান এই সময়ে আসুরী প্রবৃত্তির কুফলের জ্ঞানদান করে দৈবী প্রবৃত্তি ধারণের প্রেরণা ও শক্তিদান করে আদর্শ জীবনশৈলী আয়ত্ত করান।

ভরা থাক স্মৃতি সুধায়

- ব্রহ্মাকুমার দীনবন্ধু
রসুলপুর, বর্ধমান

রাজসূয় অশ্বমেধ অবিনাশী রুদ্র গীতাজ্ঞান যজ্ঞের আমি একজন যজ্ঞবৎস। বর্ধমান জেলার বড়গুল গ্রামে আমার লৌকিক বাসস্থান। পরম কল্যাণকারী শিবপিতার আমি একজন অতি ভাগ্যশালী পুত্র। ১৯৯৫ সালে আমি স্থূলকর্মের জন্য উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলায় অছড়া গ্রামে পৌঁছাই এবং সেখানে ব্রহ্মাকুমার হেমন্ত ভাই ও ব্রহ্মাকুমারী ভারতী বোনের সেবায় দিব্য ও অলৌকিক জন্মলাভ করি। জানলাম নিজেকে, খুঁজে পেলাম, বুঝতে পারলাম। পরমাত্মা শিবপিতাকে শৈশব থেকে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবতে আমি অনেক খুঁজেছি কিন্তু কোন পুরাণে বা শাস্ত্রে আমার প্রভুকে পাইনি। কারণ এই সকল পুরাণে অনেকাংশে জটিল বাক্য ও গ্লানিযুক্ত চরিত্র আছে যা উৎসাহব্যঞ্জক নয়। তাছাড়া, যে সমস্ত পুস্তক পাঠে চরিত্রের পতন হয়, সংশয় মোচন হয় না, মনে খুশি ও পবিত্রতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না সেই সকল পুস্তক ও চরিত্রকে ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞান মানাই অজ্ঞান অন্ধকারে বাস করা মনে হয়েছে। ভগবান প্রদত্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বারা আমরা জানতে পেরেছি মানুষ নিজের মত অনুযায়ী অনেক পুস্তক রচনা করেছেন, সেই পুস্তকে অজ্ঞানতাবশত দেবীদেবতাকে এমনকী ভগবানকেও গ্লানি করা হয়েছে কুশিক্ষা ও বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পেতে ওইসব পুস্তকও পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

বাবার জ্ঞানে চলার কিছুদিন পরে এক রাতে স্বপ্ন দেখছি - বাবা যেন বলছেন, বৎস, তোমার গৃহে সমূহ বিপদ, তুমি গৃহে ফিরে যাও। আমি বললাম, বাবা, বাড়ি থেকে বর্ধমানে আসার সময় ওদের সকলকে তোমাকে সমর্পণ করেছি, ভালোমন্দ তোমার দায়িত্ব। স্বপ্ন শেষে দেখি ভোর ৩টে ৩০ মিনিট। মিঠা বাবার স্মৃতিতে পাওয়ারফুল মেডিটেশন করলাম। কিছুদিন পরে জানতে পারি গৃহে পুত্র-কন্যাদ্বয়ের উপর মাটির দেওয়াল পড়েছিল। পরীক্ষায় আর অনুভবে উত্তীর্ণ হলাম। দুই শিশুরই শারীরিক কোন ক্ষতি হয়নি। কার কৃপায়? গায়ন আছে, সত্যের নৌকা হেলবে দুলবে কিন্তু ডুববে না।

আমার অলৌকিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাতীর্থ পবিত্র মধুবনে ২০০২ সালে গিয়েছিলাম। শান্তিবন স্থিত ডায়মন্ড হলে প্রথমে প্রবেশ করেই বড়দাদি প্রকাশমণিজির মৃদু হাসি ও গুলজার দাদিজির মনোমুগ্ধকর দৃষ্টিতে জীবন সার্থক করেছিলাম। এখনও সেই খুশির ঝলক স্মৃতিকে নাড়া দেয়। আমার প্রিয় ভাইবোনেদের আহ্বান জানাই, আর দেরি নয়, আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। পিতাশ্রী ব্রহ্মাবাবা, মাতেশ্বরী জগদম্বা পদচিহ্ন রেখে গেছেন। আসুন, আমরা সকলে পবিত্রতা ধারণ করে ও পাওয়ারফুল মেডিটেশন করে দেবী-দেবতারূপ ধারণ করি। আসুরী অবগুণের বিনাশ করে দৈবী গুণের স্থাপনার কর্মে সহযোগী হয়ে২১ কুলের রাজ্যভাগ্যের অধিকারী হই। সঙ্গমযুগ হল সারা কল্পের ভাগ্য তৈরির সুবর্ণ সময়। ভাগ্য তৈরি হয় শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারা। সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম হল ঈশ্বর স্মরণ ও দৈবগুণ ধারণ।

প্রিয় ভাইবোন, এই বিনাশকালে নিজের বলতে যা কিছু ছিল প্রিয় পিতাকে সমর্পণ করে হালকা অনুভব করছি। পুরুষার্থ করছি প্রকৃত নষ্টমোহ হয়ে নিশ্চিত বিজয়লাভের জন্য। বর্তমানে রসুলপুর ব্রহ্মাকুমারীজ সেন্টার থেকে জ্ঞানালোক পাচ্ছি। পুত্র, কন্যা, স্ত্রী ও আমি - সকলে বাবার প্রেরিত জ্ঞানামৃত ও মুরলী দ্বারা তৃপ্তি লাভ করছি।

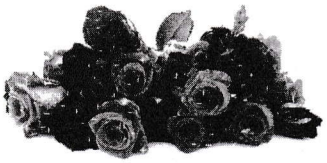

স্বাগত ২০১৫

- ব্রহ্মাকুমার ভজন
বোলপুর, শান্তিনিকেতন

২০১৪ খৃষ্টাব্দ হল শেষ, ২০১৫ খৃষ্টাব্দ আগত
পুরাতনকে বিদায় জানিয়ে নতুনকে জানাই স্বাগত।
বছরের পর বছর, এইভাবেই আসে ও যায়
নিজের ছাড়া অপরের প্রতি, নিই না কোন দায়।।
বর্তমান যুগের মানুষ, এত নিচে নেমে গেছে
সবার সম্মান নিয়ে, ছিনিমিনি খেলছে।
এখন সমাজ ও বিশ্বের পরিবর্তন নিয়ে ভাববার এসেছে সময়
না ভাবলে এই মানব জন্ম, যে বৃথা হয়ে রয়।।
সময় নষ্ট না করে, সকলে মিলে বছরের প্রথম দিনেতে
নেমে পড়ি পরিবর্তনের কাজে, এই জীবনকে সার্থক করতে।
সময়ের মূল্য অনেক, একথা সবাই জানেন
সেকেন্ডের মধ্যে শেষ হতে পারে এই মূল্যবান জীবন।।
প্রথমে চিনতে হবে নিজেকে, জানতে হবে কে আসল পিতা
আমি অবিনাশী আত্মা, পরমপিতা পরমাত্মা বা ঈশ্বর হন পিতা।
প্রত্যেক আত্মার মধ্যে আছে সাতটি গুণ
সুখ, শান্তি, প্রেম, আনন্দ, শক্তি, পবিত্রতা ও জ্ঞান।।
নিজেদের নিজস্ব গুণগুলি যদি সদা চিন্তন করি
তাহলে সহজেই নিজেকে পরিবর্তন করতে পারি।
আমাকে সবসময় হাসি-খুশিতে থাকতে দেখতে
অনেকেও নিজেকে পারে পরিবর্তন করতে।।
আবার আমরা সকলে যদি চলি ঈশ্বরের মতে
অনায়াসে বিশ্বশান্তির কাজে পারি সফল হতে।
আসুন নতুন বছরে সবাই মিলে এই দৃঢ় সংকল্প করি
যাতে অসহায়কে সহযোগ, দিশাহারাকে দিশা ও অশান্তকে শান্ত করতে পারি।।
প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারীজ ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয় এই কাজেতে
অনেকটা হয়েছে সফল, সুন্দর এক ঈশ্বরীয় পরিবার গড়তে।
আসুন, এই বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাথে সহযোগী হোন
জীবনকে ধন্য করে সম্পূর্ণ সফল করুন বিশ্বের পরিবর্তন।।

কলকাতা (মিউজিয়াম) ঃ পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর জন্মদিন ও 'চিলড্রেন্স ডে' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ছোটদের সাথে বি.কে. কানন, বি.কে. রুমকি, বি.কে. নেহা ও বি.কে. ঋতু।

শামুকপোতা (দঃ ২৪-পরগণা) ঃ খোলা আকাশের নিচে মনোরম পরিবেশে ঈশ্বরীয় অনুভূতি ও ছোটদের অঙ্কন প্রতিযোগিতার শেষে শিশুরা নৃত্য করছে, মঞ্চে উপস্থিত বি.কে. মুন্নি, বি.কে. কানন, ও বি.কে. শীলা।

কলকাতা ঃ এল.আই.সি. ইস্টার্ন জোনাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রাজযোগ শিবির শেষে অংশগ্রহণকারীদের সাথে বি.কে. মনীষা ও বি.কে. স্নিগ্ধা।

চিরকুণ্ডা ঃ দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন মাইথন ও পাঞ্চেত ড্যাম-এ ভ্রষ্টাচার উন্মিলন সেমিনারে উপস্থিত অধিকারীগণ সাথে বি.কে. পিংকি, বি.কে. অনিতা এবং অন্যান্যরা।

আলিপুরদুয়ার ঃ স্টেপিং স্টোন মডেল স্কুল-এ আয়োজিত রক্তদান শিবিরে রক্তদান করছেন বি.কে. ভাইবোনেরা।

Vol.3, Issue 5, RNI No.WBBEN/2012/42493, Dec 2014 - Jan 2015, Price ` 10/- only

ঢাকা ঃ শারদীয়া চৈতন্য দুর্গা উৎসব-২০১৪ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভ্রাতা প্রদীপ কুমার দত্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সোনালী ব্যাঙ্ক, বাংলাদেশ, সঙ্গে বি.কে. কবিতা ও বি.কে. অণিমা।

রঘুনাথগঞ্জ (বহরমপুর) ঃ রাখিবন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে 'সর্বধর্মের পিতা এক'-এর ছবি মাননীয় রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী ও তাঁর সুপুত্র অভিজিৎ মুখার্জীকে উপহার প্রদান করছেন বি.কে. রমন।

কলকাতা (মিউজিয়াম) ঃ 'উইমেন এমপ্লয়মেন্ট উইক'-এ সি.এম.সি. কর্মীবৃন্দকে নারীশক্তির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অবগত করাচ্ছেন বি.কে. চন্দ্রা ও বি.কে. জয়া।

Printed & Published by Brahma Kumari Kanan on behalf of Owner, Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya. Printed at Alpha Print House, 15E, Chowl Patty Road, Beliaghata, Kolkata-700010 and Published at Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya, 1A, Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700020. Editor's Name & Address: Samir Krishna Das, 11/2, West Road, Santoshpur, Kolkata-700075.